
কুয়াশা

প্রেমেন্দ্র মিত্র



সিগনেট প্রেস ॥ কলকাতা ২০

শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী বন্ধুবরেষু

চতুর্থ সিগনেট সংস্করণ
জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০
প্রকাশক
দিলীপকুমার গুপ্ত
সিগনেট প্রেস
১০।২ এলগিন রোড
কলকাতা ২০
প্রচ্ছদপটের ছবি
শম্ভু সাহা
মুদ্রক
প্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিঃ
৫ চিন্তামণি দাস লেন
প্রচ্ছদপট ছাপিয়েছেন
গসেন এণ্ড কোম্পানি
৭।১ গ্রাণ্ট লেন
বাঁধিয়েছেন
বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৬১।১ মির্জাপুর স্ট্রীট

দাম আড়াই টাকা


কুয়াশা



এক

ট্রেনের গতি মন্থর হইয়া আসিয়াছে···

দুই ধারে অসংখ্য লাইনের জটিল সমাবেশ ; নানা প্রকার ইঞ্জিন, যাত্রী ও মালগাড়ির উচ্ছৃঙ্খল জটলা। খানিকক্ষণ চাহিয়া দেখিতে-দেখিতে মনে কেমন একটা আনন্দমিশ্রিত আতঙ্ক জাগে। মানুষের সৃষ্ট এই যন্ত্রের জগতে মানুষকেই একান্ত অসহায়, নগণ্য মনে হয়। ধীরে মসৃণ গতিতে ট্রেন চলিয়াছে। পায়ের নিচ দিয়া শাখা লাইনগুলি থাকিয়া থাকিয়া বিশাল কৃষ্ণকায় অজগর সর্পের মতো কিলবিল করিয়া দ্রুতবেগে সরিয়া যাইতেছে। দূরের ইঞ্জিনের তীক্ষ্ণ হুইস্‌ল, গাড়ির সঙ্গে গাড়ির ধাক্কা, ট্রেনের গম্ভীর চক্রধ্বনি—সমস্ত মিলিয়া এক অপরূপ শব্দ-লোক—মানুষের কণ্ঠ সেখানে যেন অর্থহীন।

বিশাল বিজয়-তোরণের মতো স্টেশনের পশ্চিমের ওভারহেড ব্রিজ অভ্যর্থনা করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। সশব্দ সমারোহে তাহার নিচ দিয়া ট্রেন পার হইয়া গেল। ট্রেনের গতি এবার আরও মৃদু। কুলির দল প্ল্যাটফর্মের ধারে সাগ্রহ প্রতীক্ষায় নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। স্টেশনের বিরাট জঠরে ট্রেন প্রবেশ করিতেছে।

সবে সকাল হইয়াছে। হাওড়া স্টেশনের ভিতরে এখনও আবছা অন্ধকার। শুধু উর্ধ্বে স্কাইলাইটগুলা প্রভাত-সূর্যের আলো লাগিয়া স্ফটিকের মতো ঝলমল করিতেছে।

এ-যুগের মানুষের সময় নাই, মনও বুঝি অসাড়। নহিলে বিশাল স্টেশনের একটি অপরূপ মহিমা তাহার মনকেও স্পর্শ করিত। প্রয়োজনের খাতিরে গড়া একটি ইমারত রূপে নয়, প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি ব্যঞ্জনা দিয়া, ইট-কাঠ ও ধাতু নির্মিত এই আয়তন তাহার মনকে দোলা দিতে পারিত।

এখানে আছে সবই, মন্দিরের ধ্যানময় গাম্ভীর্য, অস্বচ্ছ আলোয় বহু মানুষের মিলনের রহস্য—যন্ত্র-জগতের এই দেউলে আসিয়া গতির দেবতার মূর্ত-রূপ অনুভব করিয়া বিস্ময়ে আনন্দে স্তব্ধ হইবার কথা। কিন্তু শুধু প্রাণধারণের ব্যস্ততায় মানুষের সত্যই আর সময় নাই। পুরাতন দেবতাকে সে অবহেলা করিয়াছে, নূতন দেবতাকে খুঁজিয়া পায় নাই।

ট্রেন আসিয়া লাগিল। চারিধারে প্ল্যাটফর্ম হঠাৎ জনসমাগমে, কোলাহলে মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

ট্রেন যেন জীবনের রূপক। অসংখ্য মানুষ কয়েকটি ঘণ্টার জন্য একত্র হইয়াছিল। পরিচয় সম্পূর্ণ হইতে না হইতেই আবার সবাই পৃথক হইয়া পড়িতেছে।

কুলিরা মোট লইবার ব্যস্ততায় হুড়াহুড়ি করিতেছে। কি জানি কেন, ট্রেনটা আজ প্রায় খালিই আসিয়াছে। কামরাগুলা হইতে একটি দুটির বেশি লোক বাহির হয় না।

ইণ্টার-ক্লাশের একটি ছোট কামরায় কয়েকটা কুলি প্রবেশ করিবার জন্য ঠেলাঠেলি করিতেছিল। কামরায় একটি মাত্র লোক। ট্রেন থামিলেও, তাহার যেন নামিবার ব্যস্ততা নাই। অর্থহীন দৃষ্টিতে সামনের প্ল্যাটফর্মের দিকে চাহিয়া সে বেঞ্চির উপর বসিয়াছিল।

একজন কুলি ভিতরে ঢুকিয়া বাঙ্কের উপর হইতে একটা বড় ট্রাঙ্ক একেবারে নিচে নামাইয়া ফেলিয়া বলিল—"বাবু, গাড়ি হবে তো ?"

লোকটির যেন চমক ভাঙিল। হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া কামরার খোলা দরজা দিয়া সে নিচে নামিয়া গেল।

ভদ্রলোকের কাণ্ড দেখিয়া কুলি তো অবাক। মোট-ঘাটের খোঁজ না লইয়া সে সটান চলিয়া যাইতেছে!

পিছন হইতে কুলির ডাকে লোকটি ফিরিয়া দাঁড়াইল। মোট-ঘাট কোথায় লইয়া যাইবে কুলি তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছে।

মোট-ঘাট! ভদ্রলোক যেন অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করিয়া চারিদিকে চাহিল, তারপর বিরক্তির স্বরে বলিল, "আমার তো মোট-ঘাট নেই!"

কুলিরা মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিতেছিল। এমন ব্যাপার তাহাদের কুলি-জীবনে বড় একটা ঘটে নাই নিশ্চয়ই। ব্যাপারটায় তাহাদের যে সুবিধা আছে, এটুকু অনুমান করিতে তাহাদের তেমন দেরি হইল না। তবু একজন একেবারে নিশ্চিন্ত হইবার জন্যই বোধ হয় জিজ্ঞাসা করিল, যে এ সমস্ত মাল তাঁহার কি না।

মালের মধ্যে একটি বড় ট্রাঙ্ক নিচে নামানো হইয়াছে, সেদিকে তাকাইয়া লোকটি ঘাড় নাড়িল। কুলিরা যেন এইবার যাইবার অনুমতি দিয়া বলিল, "তব যাইয়ে!" লোকটি আবার ফিরিল। যাত্রীদের ভিড়ে অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত কুলিরা একটু শঙ্কিত ও সন্দিগ্ধভাবে তাহার যাওয়া হয়তো লক্ষ্যও করিল। লক্ষ্য করিবার বিশেষ কিছু নাই। সাধারণ ভদ্রলোকের মতো চেহারা, মুখে-চোখে অস্বাভাবিক কোনো ছাপ নাই। একটু কেমন যেন অন্যমনস্ক, কেমন একটু উদ্‌ভ্রান্ত ভাব। কুলিদের পক্ষে অবশ্য অতখানি বোঝা সম্ভব নয়।

বে-ওয়ারিশ মালপত্র সব পড়িয়া ছিল। একজন কুলি তাহার সঙ্গীকে ইশারা করিয়া কাছে ডাকিয়া কানে-কানে কি বলিল।

জিনিসপত্র এমন বেশি কিছু নয়। একটা বড় স্টিল ট্রাঙ্ক আগেই নামানো হইয়াছে। কামরার ভিতর হইতে একটা মাঝারি গোছের চামড়ার স্যুটকেশ ও একটা ছোট ব্যাগ বাহির হইল।

মালগুলা লইয়া তাহারা তৎক্ষণাৎ সরিয়াই পড়িত হয়তো। কিন্তু কুলিদের মধ্যে একজনের হঠাৎ খটকা লাগিল। লোকটার বয়স হইয়াছে—অনেক দিন ধরিয়া স্টেশনে কুলিগিরি করিবার দরুন অনেক কিছু সে জানে।

অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক কুলিটি মাথায় মোট লইবার জন্য চাদরের বিঁড়ে ঠিক করিয়া বাঁধিতেছিল। বুড়া তাহার গায়ে হাত দিয়া তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া যাহা বলিল তাহার মর্ম এই, যে, ব্যাপারটা তাহার সন্দেহজনক মনে হইতেছে। এ মালপত্র রেল-পুলিশে জমা দেওয়াই উচিত।

ছোকরা কুলি ইহাতে অবশ্য চটিল, এবং বুড়ার ভয়কে উপহাস করিয়াই মোট-ঘাট মাথায় তুলিবার উদ্যোগ করিয়া জানাইল—এমন দাঁও ফস্কাইয়া দিতে সে রাজী নয়।

কিন্তু বুড়া এবার যাহা বলিল তাহাতে দাঁও মারিবার উৎসাহ আর তাহার রহিল না। সত্যই লোকটা কি আর অকারণে মালপত্র ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছে! এতক্ষণে মনে হইল, যেন পিছন হইতে ডাকিবার পর লোকটা একটু ভীতভাবেই ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বুড়া কুলির কথাটাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার প্রবৃত্তি আর তাহার হইল না। হয়তো সত্যই এই মালপত্রের ভিতর সন্দেহজনক কিছু আছে। তাহারা

চুরি করিতে গিয়া বিপদে পড়িবে। বুড়া কুলি এরকম ব্যাপার আগেও অনেক দেখিয়াছে। প্রকাণ্ড ট্রাঙ্কটার ভিতর সত্যিই একটা মানুষের লাশ যে নাই, এ-কথা কে বলিতে পারে! সুযোগ থাকিলে, এসব মাল-পত্র ফেলিয়াই তাহারা পলায়ন করিত। কিন্তু অন্যান্য কুলিরা তাহাদের মাল নামাইতে দেখিয়াছে; এ-অবস্থায় একেবারে সমস্ত দায়িত্ব এড়ানো অসম্ভব। ভয়ে-ভয়ে মাল লইয়া তাহারা রেল-পুলিশের আপিসেই পৌঁছাইয়া দিয়া আসিল।

বে-ওয়ারিশ মালের তালিকাভুক্ত হইয়া এখনো সে সমস্ত জিনিসপত্র রেলগুদামে পড়িয়া আছে না নিলামে উঠিয়া বিক্রি হইয়া গিয়াছে, আমরা বলিতে পারি না। পুলিশ সন্দেহক্রমে সে-সব জিনিস খুলিয়া দেখিয়াছিল কি না এবং দেখিলে কি-ই বা পাইয়াছিল, তাহাও আমাদের অজ্ঞাত। ট্রাঙ্কের রহস্যের কিনারা হয় নাই।



দুই

যাত্রীদের ভিড়ের ভিতর যে-ভদ্রলোক অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল, স্টেশনের বিশাল হল্-এ আবার তাহার দেখা পাওয়া গেল। অন্যমনে নিচের দিকে চাহিয়া স্টেশনের পূর্বতোরণের দিকেই সে চলিয়াছে।

প্ল্যাটফর্মের গেটের কাছে তাহাকে খানিকক্ষণের জন্য একটু বিব্রত হইতে দেখা গিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ-পকেট ও-পকেট খুঁজিয়া একটা টিকিট সে খুঁজিয়া পাইল। টিকিটটি না দেখিয়াই সে কালেক্টারের হাতে দিয়াছিল। একবার তাহার উপর চোখ বুলাইয়াই রেলকর্মচারীটিও তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিল। কেহই টিকিটটি লক্ষ্য ভালো করিয়া করে নাই। করিবার কথাও নয়। কিন্তু করিলে হয়তো এ-কাহিনী এত জটিল নাও হইতে পারিত।

সকালের প্রথম রৌদ্র পূর্বতোরণ দিয়া তখন বাঁকাভাবে স্টেশনের মসৃণ সদ্যধৌত মেঝের উপর আসিয়া পড়িয়া গলিত রৌপ্যের মতো দেখাইতেছে। চাহিতে-চাহিতে চোখ ঝলসিয়া যায়। লোকটি নিচের দিকে বোধ হয় চাহিয়া থাকিতে না পারিয়া মুখ তুলিল। তীব্র আলোয় ধাঁধা লাগিয়া সমস্ত স্টেশন অন্ধকার মনে হইল, কিন্তু তবু তাহার মনের অন্ধকারের কাছে তাহা বুঝি কিছুই নয়।

এ-অন্ধকারে তবু ঝাপসাভাবে সমস্ত জিনিস চেনা যায়; কিন্তু মনের পট তাহার একেবারে গাঢ় নিশ্ছিদ্র বিস্মরণের কালিতে লেপিত

হইয়া আছে। অতীতকে চিনিবার এতটুকু চিহ্ন তাহার কোথাও নাই।

লোকটির সম্বন্ধে সত্যকথা এইবার বলা যাইতে পারে। কিছুক্ষণ আগে অকস্মাৎ মাথার ভিতর অদ্ভুত একটি যন্ত্রণার সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকে সে ট্রেনের একটি কামরায় আবিষ্কার করিয়াছে।

ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া সে দেখিয়াছে, পরিচিত সব স্টেশন পার হইয়া ট্রেন হাওড়ার দিকে চলিয়াছে। আশেপাশের জগৎকে তাহার চেনাই মনে হইয়াছে। মনে হইয়াছে এই পথ দিয়া যাত্রা তাহার আজ নূতন নয়। আগেও সে এই সমস্ত পল্লী, প্রান্তর, কলকারখানার মাঝখান দিয়া গিয়াছে।

কিন্তু কবে? কেমন করিয়া পরিচিত এই পৃথিবীর ভিতর হঠাৎ আত্ম-পরিচয় সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছে ভাবিয়া অন্তরের মধ্যে সে ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়াছে। মাথার যন্ত্রণার অপেক্ষা এ-যন্ত্রণা যেন আরো তীব্র। সমস্ত ইতিহাস যেন তাহার স্মৃতির দ্বারপ্রান্তে অপেক্ষা করিয়া আছে, একটু চেষ্টা করিলেই যেন তাহাদের নাগাল পাওয়া যায়, কিন্তু পারা যাইতেছে না। কঠিন পাষাণ-দ্বার অটল ভাবে দাঁড়াইয়া, কোথাও তাহার এতটুকু ছিদ্র নাই, প্রাণপণে তাহাকে এতটুকু নড়াইবার উপায় নাই।

লোকটি ঘামিয়া উঠিয়াছিল আতঙ্কে। একবার মনে হইয়াছে, মনের এ সাময়িক অসাড়তা মাত্র। একটু চুপ করিয়া থাকিলেই কাটিয়া যাইবে। কামরার খোলা জানালায় প্রবল হাওয়ায় মাথা রাখিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু বৃথা! পিছনের গাঢ় অন্ধকার তেমনি দুর্ভেদ্য হইয়া রহিল। সে-অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া অতীতের কোনো আলোর রেখার প্রবেশ করিবার যেন সাধ্য নাই।

অস্থিরভাবে উঠিয়া পড়িয়া কামরার ভিতর এইবার সে পায়চারি করিতে লাগিল। ট্রেন ক্রমশই হাওড়ার দিকে অগ্রসর হইতেছে। জানালা দিয়া টেলিগ্রাফ-পোস্টে দেখা গেল আর মাত্র আট মাইল বাকি। সত্যই কি স্মৃতি তাহার একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে! বিশাল পৃথিবীর মাঝে শিশুর মতো অসহায় হইয়া আবার কি তাহাকে জীবনের নূতন পাতা খুলিতে হইবে?

পায়চারি করিতে-করিতে ক্লান্ত হইয়া এক সময়ে আবার সে বেঞ্চির উপর বসিয়া পড়িল। মাথার যন্ত্রণাটা একটু কমিয়াছে বটে; কিন্তু মনের অসহ্য অস্বস্তি সেই পরিমাণে বাড়িয়াছে।

মনের এই আতঙ্কের ভিতর গুছাইয়া চিন্তা করা সম্ভব নয়। তবু সে একবার বিশৃঙ্খল ভাবনাগুলিকে বশে আনিবার চেষ্টা করিল। এই ট্রেনে তাহার থাকিবার নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে। কোথায় যাইবার জন্য কী কারণে ট্রেনে উঠিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিতে পারিলেই রহস্য অনেকটা পরিষ্কার হইয়া যায়।

যে সব স্টেশন পার হইয়া গিয়াছে তাহার নামগুলি সে স্মরণ করিবার চেষ্টা করিল। বিশেষ কিছুই মনে হইল না।

শ্রীরামপুরের আগে আর কোনো স্টেশনের কথাই তাহার মনে নাই। শ্রীরামপুরে নিশ্চয়ই সে ওঠে নাই। স্মরণশক্তি তাহার সে পর্যন্ত বেশ প্রখর আছে; কিন্তু তাহার পরেই অন্ধকার। সেই অন্ধকারের ভিতর হইতে এই ট্রেনের সঙ্গে নূতন জীবনে নবজাত শিশুর মতো সে বাহির হইয়া আসিয়াছে।

গভীর হতাশায় সে চোখ বুজিল। ট্রেন তখন স্টেশনে প্রবেশ করিতেছে।

হাওড়া স্টেশন হইতে বাহির হইয়া কোন দিকে যাইবে, কিছুই সে ঠিক করিতে পারিল না। বিশাল নগর নিদ্রা হইতে জাগিয়া প্রভাতের আলোয় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। গঙ্গার দুই পারে মানুষের স্রোত—কোথাও বা আবর্ত। হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, এই জনতাই যেন সত্য, উহার ভিতর প্রত্যেকটি মানুষের পৃথক সত্তা যেন নাই। কিন্তু তাহা তো ঠিক নয়। প্রত্যেকটি মানুষ যে এক-একটি বিভিন্ন কাহিনীর ধারা বহন করিয়া চলিয়াছে। রাত্রির সুষুপ্তির মাঝে তাহার মতো ইহারা কেহই সে-কাহিনীর খেই হারাইয়া বসে নাই। মানুষের এই অরণ্যে সেই শুধু নামহীন, গোত্রহীন।

হঠাৎ লোকটির টিকিটের কথা মনে পড়িল।

টিকিটে তো নিশ্চয়ই কোন স্টেশন হইতে উঠিয়াছিল তাহা লেখা আছে। সে নাম দেখিলেও বোধ হয় সব কথা তাহার স্মরণ হইতে পারে। আকস্মিক উল্লাস কিন্তু পর মুহূর্তেই গভীর হতাশায় পরিণত হইল। টিকিট তো সে না দেখিয়াই প্ল্যাটফর্মের দ্বারে দিয়া আসিয়াছে। এতক্ষণে যাত্রীদের পার করিয়া দিয়া টিকিট-কালেক্টার নিশ্চয় চলিয়া গিয়াছে। যদি তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভবও হয়, তবুও এত লোকের ভিতর তাহার টিকিটের কথা স্মরণ করিয়া সে নিশ্চয় রাখে নাই। উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে অগ্রসর হইতে-হইতে লোকটি হাওড়ার পোলের উপর আসিয়া উঠিল। মন তাহার একেবারে তখন দমিয়া গিয়াছে। নিজের পরিচয় খুঁজিয়া পাইবার আশা সে প্রায় ছাড়িয়াই দিয়াছে। নগরের এই উদ্বেলিত জনসমুদ্রের মাঝে সে একেবারে নিঃসঙ্গ, স্বতন্ত্র। এই নিঃসঙ্গতার মতো ভয়াবহ অনুভূতি বুঝি আর কিছু নাই। মনের ভিতরকার বিরাট শূন্যতা যেন শ্বাস রোধ করিয়া দিতে

চায়। বাহিরের পৃথিবীর এত বর্ণ, এত রূপ, কিন্তু তাহাতে কোনো সান্ত্বনা নাই—স্মৃতির ভাণ্ডারে সে-রঙ মিলাইয়া সাজাইবার উপায় নাই বলিয়াই সমস্ত যেন অর্থহীন হইয়া গিয়াছে।

আশ্চর্যের বিষয় এই, যে, কিছুই তাহার অপরিচিত মনে হইতেছে না। এই হাওড়ার পোল দিয়া সে যেন কত বার যাতায়াত করিয়াছে। পোলের ওপারে কলিকাতার পথঘাটের নামও যেন সে স্মরণ করিতে পারে, কিন্তু স্মরণ করিতে পারে ঠিক বইএ-পড়া কাহিনীর মতো, কিছুর সহিত তাহার ব্যক্তিগত যোগ যেন কোনোদিন ছিল না।

তাহার এই দেহে এতদিন আর একটি মানুষ যেন বাস করিয়া নিজের সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ভাড়াটে বাড়ির মতো সে হঠাৎ এখানে আসিয়া উঠিয়াছে। আগের বাসিন্দার কোনো কথাই তাহার জানিবার উপায় নাই।

নিজেকে সে এবার চিনিবার চেষ্টা করে। কতই বা তাহার বয়স হইবে ? পোলে উঠিবার আগে রাস্তার ধারের একটি দোকানের আয়নায় নিজের চেহারা সে দেখিয়াছে ; ত্রিশের বেশি বয়স হইয়াছে বলিয়া মনে হয় নাই। নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিলে, চেহারাটা নিতান্ত খারাপও নয়। বেশভূষার দিকে তাকাইয়া মনে হয়, তাহার দেহের ভূতপূর্ব বাসিন্দার অবস্থাও নিতান্ত খারাপ ছিল না। পকেটে একটা মনি-ব্যাগ হইতে গোটা পাঁচেক দশটাকার নোট ও খুচরা কয়েকটা টাকা বাহির হইয়াছে। সমস্ত পকেট তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিয়া গত জীবনের চিহ্নস্বরূপ কোনো কাগজপত্র সে পায় নাই। নিজের কথা আলোচনা করিয়া ইহার বেশি কিছু সে জানিতে পারে না। এইটুকু পরিচয় লইয়াই নূতন পৃথিবীতে তাহাকে প্রাণধারণ করিবার চেষ্টা

করিতে হইবে। মরিবার উপায় নাই, ইচ্ছাও নাই। আজ হইতে স্বতন্ত্র একটি সত্তা সৃষ্টি করিয়া মানুষের মাঝখানে তাহাকে দিন কাটাইতে হইবে। কিন্তু কেমন করিয়া? ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া ভয়ে সত্যই সে শিহরিয়া উঠে।

নিজেকে খুঁজিয়া বাহির করিবার সত্যই কি আর কোনো পথ নাই? পথ চলিতে-চলিতে তাহার আশা হয় হয়তো কোনো পরিচিত লোকের সহিত দেখাও হইয়া যাইতে পারে। সে না চিনিতে পারিলেও, সে-লোকটি হয়তো প্রথমে তাহাকে সম্বোধন করিয়া তাহার মনের যবনিকা অপসারিত করিয়া দিবে। উৎসুক ভাবে পথিকদের মুখের দিকে সে তাকাইয়া দেখিতে-দেখিতে অগ্রসর হয়। পথিকেরা উদাসীন ভাবে পথ কাটাইয়া চলিয়া যায়।

মন তাহার আবার নবোদ্ঘাটিত জীবনের প্রথম কয়েকটি মুহূর্তে ফিরিয়া গিয়া অতীতের ছিন্ন সূত্র সন্ধান করিবার চেষ্টা করে। শ্রীরামপুর! শ্রীরামপুরের আগের কোনো স্টেশন হইতে সে কি ট্রেনে উঠিয়াছে? কে বলিতে পারে, সেখানে তাহার স্ত্রীপুত্র নিশ্চিন্ত মনে তাহার ফিরিবার প্রত্যাশায় আছে কিনা? বাঙলার কোন দূর নগরে, কোন অখ্যাত গ্রামে তাহার বসতি কে জানে! কল্পনার নানা চিত্র সে মনে-মনে রচনা করে। কল্পনার এই উপকরণ মনের মধ্যে আছে দেখিয়া সে একটু বিস্মিতও হয় সঙ্গে-সঙ্গে।

মনে জাগে—পানায় ঢাকা ছোট একটি পুষ্করিণীকে ঘিরিয়া কয়েকটি খড়ের কুটির। পুকুরের চারিধারে খেজুর-গুঁড়ি দিয়া কয়েকটি ঘাট তৈয়ার হইয়াছে, তাহারই একটি ঘাটে চিবুক পর্যন্ত কস্তাপাড় শাড়ির ঘোমটা টানিয়া যুবতী-বধূ বাসন ধুইতে আসিয়াছে, সঙ্গে-সঙ্গে উলঙ্গ

দুরন্ত একটি শিশু। বধূটি বিব্রত হইয়া আছে। শিশু ও ঘোমটা একসঙ্গে দুই সামলাইয়া বাসন ধোয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। শিশুটি জলের সহিত মিতালি করিবার চেষ্টায় মায়ের কাছে বাধা পাইয়া তাহার মুখের ঘোমটা সরাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

অদ্ভুত! এত কিছু থাকিতে এই দৃশ্য তাহার চোখে জাগিয়া উঠিল কেন, সে প্রথমটা ভাবিয়া পাইল না। তবে কি সত্যই এই ছবিটির সহিত তাহার কোনো যোগ কোথাও আছে?

কিন্তু এ সুখ-কল্পনা স্থায়ী হয় না। মনে পড়ে, উত্তরপাড়ার পর ট্রেনে আসিতে-আসিতে এমনি একটি দৃশ্য যেন সে দেখিয়াছে।

কে জানে, হয়তো সত্যকার প্রিয়জন তাহার কেহ নাই। সংসারে সত্যই সে আত্মীয়স্বজনহীন। কিন্তু তবু এই ত্রিশ বছরের জীবনকে কি সূত্রে সে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল? কোথায় গেল এই ত্রিশ বৎসরের ভাবনা-চিন্তা, আশা, স্বপ্ন, বেদনা। হয়তো আত্মপরিচয়ের সঙ্গে গভীর কোনো বেদনার ক্ষতও তাহার লুপ্ত হইয়া গিয়াছে বিস্মৃতির অন্ধকারে। কী সে-বেদনা কে বলিবে? বিদ্যুল্লতার মতো তীব্রপ্রভাময়ী কোনো নারী কি তাহার জীবনে আসিয়াছিল!—দেখিলে চক্ষু ধাঁধিয়া যায়, স্পর্শ করিবার স্পর্ধা করিলে সমস্ত জীবন পুড়িয়া ছারখার হয়! কিম্বা অসহায় কোনো মৃত্যু? অন্ধকারের পার হইতে দুর্বল হাত বাড়াইয়া অতি প্রিয় কেহ কি তাহার সম্মুখে জীবনের ছিন্নপ্রান্ত আঁকড়াইয়া ধরিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছে—সে কি অসহায়ভাবে দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতে বাধ্য হইয়াছে মাত্র! তাহার অতীত জীবনে সেই মৃত্যুপথযাত্রীর শেষ আকৃতি কি সমস্ত আকাশ চিরদিনের মতো ম্লান করিয়া রাখিয়াছিল?

অসম্ভব সব কল্পনা। কিছুই ইহার সত্য নয়। হয়তো অত্যন্ত সাধারণ

তাহার জীবন ছিল। প্রতিদিন একটি পরিচিত পথে তাহার জীবন আবর্তিত হইয়াছে। রোমাঞ্চকর কোনো সুখ না থাক, উৎকট কোনো দুঃখও ছিল না।

হয়তো কালও বাহির হইবার সময়ে স্ত্রী একটু হাসিয়া বলিয়াছে—"তোমার যা ভুলো মন, যা-যা বললাম মনে থাকবে তো?"

গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিয়া সে বলিয়াছে—"আর যা ভুলি, একটা জিনিস মনে থাকবে।"

স্ত্রী কৌতূহলী হইয়া বলিয়াছে—"কী?"

এবার হাসিয়া ফেলিয়া সে বলিয়াছে—"ওই মুখখানা।"

স্ত্রী রাগের ভান করিয়া বলিয়াছে—"থাক-থাক, ঢের আদিখ্যেতা হয়েছে! এ কালো-প্যাঁচার মতো মুখ আবার তোমার মনে থাকে! রাস্তায়-ঘাটে কত সুন্দর মুখ দেখবে!"

কল্পনার স্রোত মাঝ পথে থামিয়া যায়। অবাক হইয়া লোকটি ভাবে, এ সে কী করিতেছে! স্মৃতিভ্রংশের সঙ্গে মস্তিষ্কেরও তাহার কি বিকার হইয়াছে? বিস্মৃতির ঘনকৃষ্ণ যবনিকাকে কল্পনার রঙে চিহ্নিত করিবার এ হাস্যকর প্রয়াস তাহার কেন?

হাওড়ার পোল পার হইয়া এবার সে হ্যারিসন রোডে পড়িয়াছে। চলিবার কোনো উৎসাহ নাই কিন্তু থামিবেই বা কী জন্য! বাণিজ্য-কেন্দ্রের ভিতর দিয়া এখানকার পথটি অর্থসম্পর্কে বণিকের মনের মতোই নির্লজ্জভাবে কুশ্রী। মানুষের মনের সমস্ত স্নিগ্ধতাকে লুপ্ত করিয়া লোভ এখানে যেমন সর্বগ্রাসী হইয়া আছে, আকাশ ও সূর্যকে আড়াল করিবার জন্য তেমনি উদ্ধতভাবে কুৎসিত বাড়িগুলি মাথা তুলিয়াছে।

লোকটির একবার ট্রাম বা বাসে চড়িয়া এই পথটুকু পার হইয়া যাইবার

ইচ্ছা হইল। কিন্তু মনের এ-অবস্থায় হাঁটিয়া যাওয়াটাই তবু একটু তৃপ্তিকর। পদব্রজে চলিতে-চলিতেই তবু যেন একটু সুশৃঙ্খলভাবে চিন্তা করা যায়।

ভিড়ের ভিতর দিয়া যাইতে-যাইতে নিজের এই মনোভাবের কথা এবার সে ভাবিতেছিল। লোভের এই কুৎসিত রূপের প্রতি এত ঘৃণা তাহার আসিল কোথা হইতে? এইটুকু নিশ্চয়ই সে পূর্বজীবন হইতে পাইয়াছে। প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি তাহা হইলে তাহার বদলায় নাই—মনের পুরাতন কাঠামেই নূতন চেতনা লইয়া তাহাকে কাজ করিতে হইবে। কিন্তু মনের কাঠামোটিকে সম্পূর্ণভাবে চেনার সুযোগও তাহার যে নাই। ঘটনা ও আবেষ্টনের এমনি প্রতিক্রিয়ার জন্যই তাহাকে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু সত্যই কি প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি তাহার অপরিবর্তিত আছে?

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া লোকটি হ্যারিসন রোডের এক হোটেলে আসিয়া উঠিয়াছে। এখনো কাছে টাকা আছে—কয়েক-দিনের মতো বিশ্রাম করিবার ও চিন্তা করিবার সময়ও পাওয়া যাইবে। সে এই সময়ের মধ্যে তাহার ভাগ্যকে অবিচলিতভাবে স্বীকার করিয়া লওয়া ছাড়া উপায় নাই, বুঝিয়াছে।

যৌবনের মাঝামাঝি আসিয়া নূতন করিয়া জীবনের পাতায় তাহাকে নিজের কাহিনী রচনা করিতে হইবে—এই বুঝি তাহার অদৃষ্ট। ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা নিষ্ফল।

হোটেলের খাতায় তাহার নূতন নামকরণ হইয়াছে। মনে যাহা আসিয়া-

ছিল, সেই নামই সে বলিয়াছে। হোটেলের লোক তাহাকে প্রদ্যোত বসু বলিয়াই জানে।

হোটেলে খালি ঘর ছিল না। একেবারে চার তলায় একটি সংকীর্ণ ঘর প্রদ্যোতকে লইতে হইয়াছে—ভাড়া সস্তা বলিয়া সে আপত্তি করে নাই। পরে ঘর দেখিয়া সুখীই হইয়াছে। এই ঘরটি পাওয়ার ভিতরও বুঝি ভাগ্যের হাত আছে।

চারতলার ছাদে এই একটিমাত্র ঘর। জানালা খুলিলে উত্তরে দক্ষিণে বৃহৎ নগরীর অনেকখানি দেখা যায়। মানুষের বসতির এই অরণ্যের দিকে চাহিয়া প্রদ্যোত যেন তাহার অবস্থাটা বেশি করিয়া উপলব্ধি করে। এই অরণ্যের মাঝেই তাহার বিলুপ্ত জীবনের পদচিহ্ন।

রাত হইয়াছে। নিদ্রিত নগরের দীপগুলি মেঘাচ্ছন্ন রাত্রির প্রগাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া তারকালোকে যেন দুর্বল মানুষের প্রার্থনা পৌঁছাইয়া দিতে চায়। কিন্তু তাহার বিস্মৃতির মতোই দিগন্তব্যাপী মেঘপুঞ্জের কৃষ্ণযবনিকা দুর্ভেদ্য।

প্রদ্যোতের মনে হয়, সত্যই বহুদূরে কোনো বাতায়নপ্রান্তে কোনো প্রতীক্ষমানা বধূর নয়নও যেন দীপ হইয়া সংকেত করিতে চাহিতেছে। কাহার স্বামী ফিরিয়া আসে নাই—কোন শিশুপুত্রের পিতা বিস্মৃতির পার হইতে পুত্রের কান্নায় সাড়া দিতে পারিতেছে না।

ঘুমাইবার জন্য প্রদ্যোত সামনের জানালা বন্ধ করিয়া দেয়। আশা হয়, হয়তো কাল সকালে তন্দ্রার ঘোরের সঙ্গে মনের এই কুয়াশাও কাটিয়া যাইবে। জীবনের ছিন্নসূত্র সে খুঁজিয়া পাইবে।

তিন

বাহিরের কলরবে প্রদ্যোতের পরদিন সকালে ঘুম ভাঙে। কিন্তু বিছানা হইতে তাহার উঠিতে ইচ্ছা করে না। সে বুঝিতে পারে রাত্রির সুষুপ্তি তাহার মনের বদ্ধ দ্বার খুলিতে পারে নাই। স্মৃতির প্রকোষ্ঠ তাহার তেমনি শূন্যই আছে।

নূতন জগতে সে একদিনের শিশু মাত্র। এই একদিনের সমস্ত কথা তাহার স্পষ্ট মনে পড়ে, কিন্তু তাহার পরেই অন্ধকার পটভূমি। সে-অন্ধকারে এতটুকু আলোর চিহ্ন কোথাও নাই। গাঢ় হতাশায় প্রদ্যোতের মন ভরিয়া যায়। সকালে উঠিয়া সে কি-ই বা করিবে! দেহের প্রয়োজন মেটানো ছাড়া আর কিছুই তো করিবার নাই। বাঁচা মানে শুধু দেহের প্রয়োজন মেটানো যে নয়—এ-কথা আর কোনো প্রকারে ইহার চেয়ে গভীর ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিত কিনা তাহার সন্দেহ হয়। স্মৃতির ধারাবাহিকতার সাহায্যে জীবনের একটি বিশিষ্ট রূপ দেওয়া ছাড়া আর কিছুতে অস্তিত্বের সার্থকতা আছে বলিয়া তাহার মনে হয় না। সে সার্থকতা হইতে সে বঞ্চিত। নিজেকে তাহার একান্ত নিরর্থক মনে হয়। মনের শূন্য পট লইয়া শুধু বাঁচিবার অভ্যাসে জীবন-ধারণ করায় কোনো আনন্দই যে নাই। তাহার মনে হয়, স্মৃতি বিলুপ্ত হওয়ার সঙ্গে তাহার এ-অস্তিত্ব মুছিয়া গেলেই ভালো হইত, শূন্য মনের ভার তাহাকে বহন করিতে হইত না। সে এখন বেশ যেন বুঝিতে

পারিয়াছে, পুরাতন জীবনের সহিত তাহার আর পরিচয় হইবে না। তাহার এই দেহে আর একজন বহুদিন বাস করিয়া গিয়াছে, এইটুকু মাত্র সে জানে। কিন্তু এই দেহে যাহার সমাধি হইয়াছে, বিস্মৃতির স্তরগুলি ভেদ করিয়া তাহার সন্ধান কোনোদিনই সে পাইবে না। নব-চেতনায় জীবন হয়তো দীর্ঘই হইবে, ভাবিয়া তাহার ভয় হয়। পৃথিবীতে কিছুর সহিত যাহার সম্বন্ধ নাই, সে জীবন বহন করার মতো অভিশাপ তাহার মনে হয় বুঝি আর কিছু নাই।

প্রদ্যোতের মনে এই গভীর হতাশা কিন্তু স্থায়ী হয় না। বেলা বাড়িবার সঙ্গে-সঙ্গে তাহার মন অনেকটা স্থির হইয়া আসে। বিচিত্র বর্ণসমারোহ লইয়া বর্তমান ধীরে-ধীরে তাহার মনকে অধিকার করিতেছে। বিলুপ্ত অতীতের পদচিহ্ন খুঁজিবার ব্যর্থ-চেষ্টায় হয়রান হইয়া কোনো লাভ নাই বুঝিয়া তাহার মন একটু বুঝি প্রবোধ মানিয়াছে। বিস্মৃতির যবনিকা কোনোদিন আপনা হইতে সরিয়া যায় ভালোই। আর যদি সে-সৌভাগ্য তাহার না হয়, তাহা হইলে সে বুঝিয়াছে, এই জীবনকেই তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। সেই জন্যই তাহার প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। অতি প্রিয়-জনের শোকও মানুষকে ভুলিতে হয়। তাহাকে অবশ্য আরও বেশি কিছু করিতে হইবে—নিজের মৃত্যুর শোক তাহাকে ভুলিতে হইবে। কিন্তু না ভুলিয়া আর উপায় কি! অন্ধকারে প্রাণপণে হাতড়াইয়া ফিরিলেও কিছু মিলিবে, এমন ভরসা তো নাই। তাহাকে নূতন চেতনার জগতের সম্মুখীন হইতেই হইবে। বিস্মৃতিনিমগ্ন গতজীবন কবে জাগিয়া উঠিবে, তাহার নিষ্ফল প্রতীক্ষায় না থাকিয়া, নূতন করিয়া ভিত্তি গাঁথিবার চেষ্টা তাহাকে করিতেই হইবে।

নূতন জীবনের প্রথম সমস্যা দেখা দেয়—অর্থের অভাব রূপে। হাতে

যাহা পুঁজি আছে তাহাতে হোটেলে বেশিদিন থাকা যাইবে না। অন্যান্য ভাবনার ভিতর জীবিকানির্বাহের চিন্তাই প্রদ্যোতকুমারের কাছে বড় হইয়া ওঠে।

এই টাকা ফুরাইবার আগে কি যে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে তাহা এ-পর্যন্ত সে ভাবিয়া পায় নাই। ব্যাকুল হইয়া খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখিয়াছে, কয়েক জায়গায় ছুটাছুটিও করিয়াছে; আশা কোথাও পায় নাই।

প্রতিদিন তাহার সঞ্চয় ফুরাইয়া আসার সঙ্গে-সঙ্গে প্রদ্যোতের আশঙ্কার আর সীমা থাকে না। ঐ টাকা কটি শেষ হইলেই একেবারে সে নিরাশ্রয় হইবে। কোথাও গিয়া তাহার দাঁড়াইবার জায়গা নাই। কাহারও কাছে সাহায্য পাইবার আশা সে রাখে না। অপরিচিত পৃথিবীতে সে নিঃসহায়।

তাহাকে নূতন করিয়া জীবন আরম্ভ করিতে হইবে, কিন্তু তাহার জন্য প্রথম যাহা প্রয়োজন তাহাই সে সংগ্রহ করিবে কেমন করিয়া! পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষ পরস্পরের সহিত নানা সম্বন্ধে শাখায়-প্রশাখায় জড়াজড়ি করিয়া সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া আছে—বাহির হইতে হঠাৎ আসিয়া তাহার ভিতর জায়গা পাওয়া যে অসম্ভব।

জীবিকানির্বাহের জন্য মানুষের সংসারে একটা কাজ তাহার চাই। কিন্তু কি কাজের সে উপযুক্ত তাহা কয়দিনে প্রদ্যোত ভাবিয়া পায় নাই। বিস্মৃতজীবনে কি কাজ তাহার ছিল, কে জানে! নূতন চেতনায় কোনো কিছুর প্রতিই অনুরক্তি সে এখনও খুঁজিয়া পাইতেছে না। শিক্ষাদীক্ষার দিক দিয়া বিশেষ দরিদ্র সে নয়। তাহার আত্মবিস্মৃতির একটি রহস্যময় দিক এই, যে নিজের পরিচয় ছাড়া আর অনেক কিছুই তাহার মনে

আছে। বিদ্যার্জন সে যে একদিন করিয়াছিল, এ-বিষয়ে তাহার কোনো সন্দেহ নাই। সে-বিদ্যা সে বিস্মৃতও হয় নাই।
কত বিষয়ে যে তাহার জ্ঞান আছে তাহার পরিচয় পাইয়া সে নিজেই অবাক হইয়া যায়। নিজের কাছেই সে যেন একটা অন্ধকার অনাবিষ্কৃত জগৎ। সে জগৎকে সম্পূর্ণভাবে দেখা যায় না, বাহিরের সংসারের সঙ্গে তাহার যোগসূত্রগুলিও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে—তবু সেই অন্ধকারের ভিতর হইতে ছাড়া-ছাড়া ভাবে অনেক কিছু ভাসিয়া আসে।
কিন্তু এই অসংলগ্ন মনের ঐশ্বর্য-পরিচয় লইয়া সংসারে নিজের ঠাঁই খুঁজিয়া লওয়া সহজ নয়। প্রদ্যোত এখনও পর্যন্ত কোন দিক দিয়া অগ্রসর হইবে, তাহা ঠিক করিতে পারে নাই।

কয়দিন হইল, তাহার ঘরে আর এক ভদ্রলোকের সিট পড়িয়াছে। অত্যন্ত শীর্ণ ও খর্বকায় হওয়ার দরুন সহজে লোকটির বয়স বোঝা যায় না। মনে হয়, কৈশোর পার হইবার পর তাহার দেহের বৃদ্ধি একেবারে স্থগিত হইয়া আছে। শুধু মুখের রেখাগুলি একটু কঠিন হইয়াছে মাত্র। তাহার ঘরের নিভৃত নির্জনতাটুকু দূর হওয়ায় প্রথম দিন লোকটিকে তাহার অত্যন্ত খারাপই লাগিয়াছিল। আলাপ করিবার উৎসাহ তাহার হয় নাই। ভদ্রলোকের দিক হইতে আগ্রহ যেটুকু ছিল—তাহার ঔদাসীন্যে সেটুকু বিফল হইয়াছে।
কিন্তু ক্রমশ বোঝা গেল, লোকটি অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির। বিশেষ কোনো হাঙ্গাম নাই। যতক্ষণ ঘরে থাকেন বইএর মধ্যে এমন করিয়া মগ্ন থাকেন, যে ঘরে লোক আছে বলিয়াই মনে হয় না।



ধীরে-ধীরে একটু-একটু করিয়া দুইজনের পরিচয় হইয়াছে। পরিচয় একতরফাই বলিতে হইবে। প্রদ্যোত নিজের সম্বন্ধে যথাসম্ভব নীরবই থাকিয়াছে। মিথ্যা একটা কাহিনী তৈরি করিয়া বলিতে তাহার ভালো লাগে না।

অমলবাবু কিন্তু একটু-একটু করিয়া নিজের সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছেন। অমলবাবু সেই ধরনের দুর্বলপ্রকৃতির মানুষ, হঠাৎ দেখিলে যাহাদের অত্যন্ত আত্মস্থ, অত্যন্ত চাপা বলিয়া মনে হয়। মনে হয়, আপনার চারিধারে তাহারা মৌনতার দুর্ভেদ্য প্রাকার তুলিয়া নিজেদের মধ্যে বাস করিতে ভালোবাসে। কিন্তু তাহাদের এই আত্মস্থতার মূলে সঙ্কোচ ছাড়া আর কিছুই নাই। বাহির হইতে আঘাত পাওয়ার আশঙ্কাতেই তাহারা নিজেদের অনধিগম্য বলিয়া প্রমাণ করিতে চায়। কিন্তু মানুষের সহানুভূতির এতটুকু উত্তাপে তাহাদের চারিধারের প্রাচীর তুষারের মতো গলিয়া যাইতে দেরি হয় না। বাহিরের কাঠিন্যের আড়ালে তাহাদের কোমল হৃদয় মানুষের সমবেদনার জন্যই বুঝি লালায়িত হইয়া থাকে।

নূতন জীবনে অমলবাবু প্রদ্যোতের প্রথম আত্মীয়। এই রকম একটি লোকের সহিত তাহার প্রথম পরিচয়ের প্রয়োজন বুঝি ছিল। এই নিরীহ লোকটির কাছে তাহার জীবনের খুঁটিনাটি বিবরণ শুনিতে শুনিতে প্রদ্যোতের প্রথম একটু ঈর্ষাই হয়। স্মৃতির যে সূত্র ছিন্ন হওয়ায় তাহার অস্তিত্ব অর্থহীন হইয়া আছে, এই লোকটির কাছে তাহার মূল্য কিছুই নাই। অতীতের ধারা হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলেই যেন অমলবাবু বাঁচেন। তাঁহার জীবন-কাহিনী অবশ্য মধুর নয়; কিন্তু তিক্ত হউক, করুণ হউক, এমনি একটি জীবনের ধারার

সহিত সংলগ্ন হইতে পারিলে যে প্রদ্যোত নিশ্চিন্ত হইত। যে সংকীর্ণ দ্বীপের মধ্যে সে নির্বাসিত হইয়াছে তাহার চারিদিকে শুধু দিক-চিহ্নহীন অন্ধকার দুস্তর সাগর। এই দ্বীপের ভয়াবহ নির্জনতা সহ্য করিবার ক্ষমতা তাহার আছে কিনা সন্দেহ হয়। সমস্ত সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন, অনধ্যুষিত এই দ্বীপটি এখন হইতে তাহাকে একাকী সার্থকতায় শ্যামল করিয়া তুলিতে হইবে। ইহাকে নূতন করিয়া রূপ দিবার ভার তাহার উপর। সে-শক্তি তাহার আছে কি ?

অবশ্য মানুষ মাত্রেই বুঝি এমনি এক-একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ, সৃষ্টির রহস্য সাগরে ঘেরা! প্রত্যেক নবজাত শিশুকেই অমনি একটি স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন জগৎ ধীরে-ধীরে গড়িয়া তুলিতে হয়। কিন্তু তাহাদের পিছনে বহু মানুষের অভিজ্ঞতা সাহায্য করে। তাহাদের দ্বীপের মৃত্তিকা বহু যুগের স্মৃতির ধারায় উর্বর করিয়া তোলে। চারিধারে সেখানে পথচিহ্ন। তা ছাড়া নিজের জগৎকে ধীরে-ধীরে চিনিবার সময় শিশু পায়। চেতনা যখন তাহার সুপরিস্ফুট হয় তখন বাহিরের জগতের সহিত তাহার পরিচয় ও আদানপ্রদানের বহু পথ নির্মিত হইয়া গিয়াছে। নিজের গতি নিয়ন্ত্রিত করিবার মতো নির্দেশ সে পাইয়াছে। তাহার ভবিষ্যতের ছক প্রায় কাটাই থাকে, একটু-আধটু অদল-বদল করা মাত্র তাহার প্রয়োজন।

কিন্তু পূর্ণবিকশিত চেতনা লইয়া যে স্বতন্ত্র জগতে সে অকস্মাৎ ভূমিষ্ঠ হইল তাহা পৃথিবীর চলাচলের পথের একেবারে বাহিরে। একেবারে অনাথ হইয়া যে শিশু জন্মায়, তাহারও চারিধারে স্মৃতির ইতিহাস সঞ্চিত হইয়া ওঠে। চেতনার সম্পূর্ণ স্ফুরণের পূর্বেই বাহিরের সঙ্গে তাহার নানা সম্বন্ধ নিরূপিত হইয়া যায়। মানুষের পরিচয়ের গণ্ডির

মধ্যে সে স্থান পায়। সেই অনাথ শিশুর চেয়েও প্রদ্যোত হতভাগ্য। সংসারের মাঝে থাকিয়াও সে সব কিছুর বাহিরে। পৃথিবীর চেতনার সহিত তাহার সত্তার সংযোগ নাই; যে-জীবন সে গড়িয়া তুলিতে চায় তাহার কোনো অবলম্বন সে পাইবে না। নবজাত শিশুর সমস্ত সুযোগ হইতে সে বঞ্চিত, শুধু তাহার অসহায় নিঃসঙ্গতা সে লাভ করিয়াছে! অথচ অমলবাবু এমনি নিঃসঙ্গতাই যেন কামনা করেন। অতীতকে অস্বীকার করিতে পারিলেই যেন তিনি বাঁচিয়া যান।

সকাল হইতে অমলবাবু বাক্স পেঁটরা গুছাইতেছেন। প্রদ্যোত জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছে, তিনি আজ দেশে যাইবেন।

কিন্তু খাইবার পর ঘরে আসিয়া দেখা গেল, মোট-ঘাট খুলিয়া ফেলিয়া অমলবাবু বিষণ্নমুখে মাথায় হাত দিয়া নিজের বিছানায় বসিয়া আছেন। প্রদ্যোত বিস্মিত হইয়া তাকাইতেই অমলবাবু হতাশ ভাবে বলিলেন—"নাঃ, যাব না, ঠিক করলাম!"

তারপর নিজের মনেই বলিলেন—"কী হবে গিয়ে! আমি গিয়ে কিছু যে কিনারা করতে পারব না, তা তারাও জানে, আমিও জানি। তবু এ-প্রহসনে দরকার কি!"

প্রদ্যোত ইতিমধ্যে তাঁহার দেশের কথা অনেক শুনিয়াছে। সেই পুরাতন দুঃখের ইতিহাস। কিন্তু অমলবাবু যেভাবে তাহা গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে নূতনত্ব আছে। দেনার দায়ে দেশে তাঁহাদের সামান্য জমিজমা বন্ধক পড়িয়াছে। এবার কিছু ব্যবস্থা করিতে না পারিলে নিলামে উঠিবে। অবস্থা অমলবাবুর সত্যই খারাপ। বিধবা

একটি অসহায়া ভগিনী তিনটি পুত্র-কন্যা লইয়া তাঁহাদের বাড়িতেই আশ্রয় লইয়াছে, তাহাদের সমস্ত খরচই চালাইতে হয়। আরও তিন ভাই বোন আছে—বোনটির বিবাহের বয়স প্রায় হইয়া আসিল। মাহিনার অভাবে ভাই দুটির স্কুল যাওয়া বন্ধ হইয়াছে। মা দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন, স্কুলে না যাইতে পারিলে সারাদিন পাড়ার বদছেলের সঙ্গে মিলিয়া তাহারা একেবারে বকাটে হইয়া যাইবে ইত্যাদি।

উৎসাহ দিবার চেষ্টা করিয়া প্রদ্যোত বলিল—"তবু আপনার একবার যাওয়া দরকার। তারা একেবারে অসহায়।"

অমলবাবু যেন বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"আর আমারই কে সহায় আছে!"

"তবু আপনি বাড়ির একমাত্র ভরসা!"

অমলবাবু এবার মাথা তুলিলেন না, ক্লান্তকণ্ঠে বলিলেন—"ওই কথা বাবা মরবার পর এই বারো বছর শুনে আসছি। ওই কথায় বিশ্বাস করে নিজের সমস্ত ভবিষ্যৎ ধীরে-ধীরে বিসর্জন দিয়েছি; কিন্তু এখন আর ভালো লাগে না, প্রদ্যোতবাবু! একটা সীমা ছাড়িয়ে গেলে আত্মত্যাগও পাপ হয়ে দাঁড়ায়। মনে হয়, সেই পাপই করেছি।"

প্রদ্যোত চুপ করিয়া রহিল। অমলবাবু আবার বলিলেন—"অপরের জীবনের হিসেবের ভুল শোধরাতে নিজেকে সর্বস্বান্ত করে ফেলায় কোথায় মহত্ত্ব আমি তো আর দেখতে পাই না। আমার নিজের জীবনের কোনো মূল্য কি নেই—নিজের প্রতি কোনো কর্তব্যই নেই বলতে চান! বাবা বেহিসেবী ভাবে খরচ করে দেনা করে গেছেন, তারই প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আমাকে জীবনের সমস্ত সার্থকতা থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে, এক মুমূর্ষু অকর্মণ্য বৃদ্ধের হাতে মেয়েকে সঁপে দিয়ে তিনি যে নির্বুদ্ধিতা

করে গেছেন তারই ফলে আমার সমস্ত জীবন নষ্ট হয়ে যাবে—এর কি কোনো মানে হয়?"

প্রদ্যোত বলিতে যাইতেছিল—"কিন্তু উপায় কী?"

তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া অমলবাবু বলিলেন, "উপায় কী একেবারেই নেই! যদি সমস্ত ভুলে থাকতে পারতাম, নিজেকে বাঁচাবার জন্যে যদি অতীতের এই বেড়ি একেবারে ভেঙে ফেলতে পারতাম! জীর্ণ পুরাতন একটা সংসারকে, নিজের জীবন ছিন্নভিন্ন করে তালি দিয়ে বাঁচিয়ে রাখায় আমার কী সার্থকতা? কী লাভ হল এতে বলুন—তাদের দুর্দশাও দূর হল না, নিজেকেও ব্যর্থ করলাম!"

প্রদ্যোত চুপ করিয়াছিল। অমলবাবু উঠিয়া পায়চারি করিতে-করিতে উত্তেজিতভাবে বলিতে লাগিলেন—"দুবেলা চারটে টিউশনি করি, পেলে পাঁচটাতেও আপত্তি নেই—আজ দশবছর ধরে এমনি করছি। সমস্ত মন একেবারে অসাড় হয়ে গেছে। অভ্যাসমতো প্রতিদিনের কাজ সেরে যাই, ভালো করে বেঁচে আছি কি না তাও বুঝতে পারি না। এই জীবনই কি আদর্শ বলে মনে করতে হবে! যে অতীত আমার সমস্ত ভবিষ্যতকে নিষ্ফল করে দিল তার ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকবার কী প্রয়োজন? কেন, তাকে অস্বীকার করবার আমার উপায় নেই?"

কিন্তু অস্বীকার করিবার উপায় বোধ হয় নাই। জিনিসপত্র নূতন করিয়া গুছাইয়া অমলবাবু এক সময়ে আবার দেশের জন্যই রওনা হন।

অমলবাবুর এই মনোভাব প্রদ্যোতের ভালো লাগে নাই। ইহার ভিতর কেমন একটা দুর্বল স্বার্থপরতার আভাসই সে পাইয়াছে। তাহার মনে

হইয়াছে, প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার শক্তি নাই বলিয়াই, অমলবাবু নিজের অক্ষমতার এমনি কৈফিয়ৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। তবু অমলবাবুর কথায় একটা নূতন দিক দেখিতে সে পায়। সত্যই এদিকটি সে এ-পর্যন্ত ভাবিয়া দেখে নাই। অতীতের স্মৃতি যে দুর্বহ ভার হইয়াও উঠিতে পারে, ইহা তাহার জানা ছিল না। সেদিক দিয়া সত্যই সে মুক্ত, স্বাধীন। নিজের জীবন এখন হইতে ইচ্ছামতো গড়িবার পরিপূর্ণ সুযোগ সে পাইয়াছে। কে জানে পিছনের ইতিহাস তাহার কেমন! অমলবাবুর চেয়েও হয়তো সেখানে ভয়াবহ জটিলতা আছে। সে-জটিলতা হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টাতেই হয়তো তাহার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হইয়া যাইত, নিজেকে সার্থক করিবার অবসর আর তাহার মিলিত না! স্মৃতির ধারা লুপ্ত করিয়া ভাগ্যদেবতা তাহাকে সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। পরের হিসাবের খাতার জের তাহাকে টানিতে হইবে না। একেবারে শুভ্র অকলঙ্ক পাতায় তাহার জীবন-কাহিনী রচনা করিবার সৌভাগ্য সে পাইয়াছে।

সেই কাহিনী কেমন করিয়া রচনা করিবে, তাহা অবশ্য ভাবিবার বিষয়। চারিধারে অধিকাংশ মানুষ যে-জীবন যাপন করিতেছে, তাহার কথা ভাবিলে হতাশই হইতে হয়। অস্তিত্বের নিম্নতম স্তরে শুধু টিঁকিয়া থাকিবার জন্য নির্লজ্জ ঠেলাঠেলি করাতেই তাহাদের সমস্ত শক্তি তো ব্যয় হইয়া যাইতেছে। তাহারও কি তাই হইবে? মূলের প্রয়োজনে মাটিতে আবদ্ধ থাকিয়া ঊর্ধ্ব আকাশে ফুল ফুটাইবার অবকাশ কি তাহার মিলিবে না?

এই ঠেলাঠেলির ভিড়ে তাহাকেও ভিড়িতে হইবে ভাবিয়া তাহার অত্যন্ত খারাপ লাগে। অথচ তাহার বাঁচিয়া থাকিবার জন্য ইহা না

করিলেও নয়! তবু সে মনে-মনে শপথ করে, ইহার উর্ধ্বে সে উঠিবেই।

স্মৃতির পুরাতন পাতা যদি চিরদিনের মতো বন্ধ হইয়া গিয়া থাকে, যদি সত্যই বন্ধনহীন করিয়া ভাগ্য তাহাকে নূতন পৃথিবীতে জন্ম দিয়া থাকে, তাহা হইলে ভাগ্যের এ-দান সে মাথা পাতিয়া লইয়া তাহার পরিপূর্ণ মর্যাদা সে রাখিবে। আত্মবিস্মৃতি এই বুঝি প্রথম তাহার তেমন ভয়াবহ বলিয়া মনে হয় না। বন্ধনহীনতারও একটি সান্ত্বনা আছে। অমলবাবুর মতো অতীতের বিরুদ্ধে নিষ্ফল আক্রোশ প্রকাশ করা সে পছন্দ করে না, কিন্তু পিছনের টান যেখানে অত প্রবল সেখানে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়া যে অত্যন্ত কঠিন, ইহা তাহাকে স্বীকার করিতেই হয়। এ যেন জলা জমিতে ঘর বাঁধিবার চেষ্টা। অর্ধেক উপকরণ দুর্বল মৃত্তিকাই গ্রাস করিয়া লয়। জীবনের পুঁজি যাহার অল্প, নূতন আয়তন নির্মাণ করার বদলে নিজের সমাধিই তাহাকে শেষ পর্যন্ত রচনা করিতে হয়।

প্রদ্যোতের মনে হয়, তাহার চারিধারে কত মানুষই তো এমনি ভাবে ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। পৃথিবীকে মুক্তির ক্ষেত্র করিয়া এখনও মানুষ গড়িতে পারে নাই। জীবনের নূতন পথিককে পাথেয় স্বরূপ যাহা দেওয়া হয়, অতীতের ঋণ তাহার স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া হয় তাহার চেয়ে অনেক বেশি। সে-ঋণ শোধ না করিলে নয়।

গত জীবনে হয়তো অমলবাবুর মতো দারিদ্র্য তাহার পথের বাধা ছিল না। কিন্তু দারিদ্র্যের চেয়েও জীবনসাধনার কঠিন অন্তরায় তো আছে। না, আত্মবিস্মৃতির জন্য বৃথা শোক আর সে করিবে না। হয়তো এই তাহার ভালো।

তাহার বন্ধনহীনতার এ-সান্ত্বনায় ভাগ্যদেবতা বোধ হয় অলক্ষ্যে হাসেন প্রদ্যোতের জীবনের ছক তিনি অনেক জটিল করিয়া কাটিয়াছেন।

দিন কয়েক বাদে সকাল বেলা প্রদ্যোত দোতালার এক ভদ্রলোকের খবরের কাগজটা উল্‌টাইয়া দেখিতেছিল। কয়দিন ধরিয়া সকাল বেলা খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখাই তাহার কাজ হইয়াছে। অনেক রকমের কর্ম-খালির বিজ্ঞাপন এ-পর্যন্ত তাহার চোখে পড়িয়াছে। নিজের উপযুক্ত একটাও মনে না হইলেও, দরখাস্ত সে কয়েকটা করিতে ভোলে নাই, ফল অবশ্য এখনও কিছু হইয়াছে বলা যায় না।

ম্যানেজারবাবু বারান্দা দিয়া যাইতেছিলেন, তাহাকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"আপনার একটা চিঠি আছে, প্রদ্যোতবাবু, আপনার ঘর বন্ধ দেখে দরজার ফাঁক দিয়ে ফেলে দিয়ে এলাম।" ম্যানেজারবাবু চলিয়া গেলেন। প্রদ্যোত অবাক হইয়া কাগজ রাখিয়া দিল। ম্যানেজার-বাবু তাহাকে পরিহাস করিয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছিল। তাহার চিঠি? তাহাকে কে চিঠি লিখিবে। এক সপ্তাহ পৃথিবীতে যাহার আয়ু, তাহার নামে কে চিঠি পাঠাইতে পারে! কৌতূহলী হইয়া প্রদ্যোত উপরে উঠিয়া গেল।

ঘর খুলিবার পর দেখা গেল, সত্যই তাহার নামে চিঠি আসিয়াছে। আসিয়াছে অমলবাবুর কাছ হইতে। তিনি লিখিয়াছেন, যে দুই দিনের ছুটি লইয়া দেশে গিয়া তিনি জ্বরে পড়িয়াছেন। জ্বরটা খারাপ বলিয়াই মনে হইতেছে! সারিয়া ফিরিতে বোধ হয় বিলম্ব হইবে। প্রদ্যোত যদি দয়া করিয়া তাঁহার ছাত্রদের এই কয়দিন পড়াইবার ভার লয়, তাহা

হইলে তাঁহার বিশেষ উপকার হয়। বদলি না দিয়া কামাই করিলে, কাজগুলি তাঁহার যাইতে পারে। যে কয়দিন প্রদ্যোত তাঁহার পরিবর্তে পড়াইবে, সে কয়দিনের মাহিনা লইতে যেন সে দ্বিধা না করে। অমলবাবু ছাত্রদের ঠিকানাও চিঠিতে জানাইয়াছেন।

অমলবাবুর অসুখের সংবাদে দুঃখিত হইলেও, নিঃসম্বল অবস্থায় এই সুবিধাটুকু পাওয়ায় প্রদ্যোত খুশি না হইয়া পারিল না! অমলবাবুকে আশ্বস্ত করিবার জন্য একটা চিঠি লিখিয়া দিয়া সেই দিনই সে তাঁহার ছাত্রদের বাড়ি খুঁজিতে বাহির হইল।

অমলবাবুর অসুখ একটু বেশি হইলেও, দিন সাতেকের বেশি তাঁহার বিলম্ব হইবে, প্রদ্যোত ভাবে নাই। কিন্তু সাত দিনের জায়গায় দুই সপ্তাহ কাটিয়া গেল, তিনি ফিরিলেন না। কয়দিনের পরিচয় হইলেও, অমলবাবুর জন্য এবার প্রদ্যোত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। একটা চিঠি দিবে কিনা ভাবিতেছে, এমন সময়ে সেখান হইতে যে-খবর আসিল তাহাতে সে অবাক হইয়া গেল।

কাঁচা হাতের লেখা আঁকা-বাঁকা অক্ষরের একটি চিঠি। অমলবাবুর ভাই লিখিয়াছে, যে তাহার দাদার অসুখ অত্যন্ত গুরুতর। দুই জায়গায় আগের মাসের তাঁহার যে মাহিনা পাওনা আছে প্রদ্যোতবাবু যদি তাহা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে বড় ভালো হয়। পয়সার অভাবে দাদার চিকিৎসা হইতেছে না।

প্রদ্যোত অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল। এ-পর্যন্ত গভীর ভাবে ওই একটি লোকের সহিতই তাহার পরিচয় হইয়াছে। নিজের অজ্ঞাতে তাহার

জীবনের এই প্রথম আত্মীয়ের উপর কতখানি অনুরাগ তাহার যে জন্মিয়াছে এই ব্যাপারে সে বুঝিতে পারিল।

বাকি মাহিনা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে সে দেরি করিল না; কিন্তু পাঠাইবার পর তাহার মনে হইল, টাকাটা সে নিজে হাতে লইয়া গেলেও পারিত। অমলবাবুর বাড়ির অবস্থা সে যাহা শুনিয়াছে তাহাতে মনে হয় টাকা হইলেও তত্ত্বাবধানের লোক মেলা তাহাদের দুষ্কর। দেশ তাহাদের এমন কিছু দূর নয়, একবার নিজে গিয়া অবস্থাটা দেখিয়া আসিলে ক্ষতি ছিল না।

অমলবাবুর ভাইকে তাহার দাদার অবস্থা সত্বর জানাইবার জন্য সে চিঠি দিয়াছিল। দিন-তিনেকের মধ্যে তাহার কোনো উত্তর না পাইয়া সে একদিন সত্যই রওনা হইয়া পড়িল। মাত্র কয়দিনের পরিচিত একটি লোকের জন্য তাহার এ-ব্যাকুলতা একটু বিস্ময়কর ঠেকিতে পারে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বোঝা যায়, প্রদ্যোতের নূতন জীবনে এই সামান্য পরিচয়ের মূল্য বড় কম নয়। তা ছাড়া এত লোক থাকিতে অমলবাবু তাহাকেই পত্র লিখিয়া নিজের কাজ দিয়া যে সাময়িক উপকার করিয়াছেন তাহার জন্য কৃতজ্ঞতাও ছিল।

চার

অমলবাবুর দেশের স্টেশন রেলে মাত্র ঘণ্টা দু-একের পথ। কিন্তু গ্রামে যাইবার জন্য স্টেশন হইতে মাইল তিনেক হাঁটিতে হয়। সকালে বাহির হইলেও, লোকের কাছে পথ জিজ্ঞাসা করিয়া অনেক ঘুরিয়া যখন সে অমলবাবুর গ্রামে পৌঁছিল তখন বেলা প্রায় বারোটা।

অমলবাবুর জন্য মন উদ্বিগ্ন হইলেও দীর্ঘ গ্রামের পথ তাহার অত্যন্ত ভালো লাগিয়াছে। সে ঠিক ধরিতে পারে না, কিন্তু মনে হয় এমনিতরো একটি গ্রামের ছবি তাহার মনে কোথায় যেন আছে। দক্ষিণ বাঙলার এই গ্রামটির সৌন্দর্য, সত্য কথা বলিতে গেলে, এমন কিছু নাই। প্রকৃতি এখানে শাসনের অভাবে যেন উচ্ছৃঙ্খল ও উদ্ধত হইয়া হীনবীর্য মানুষের চিহ্ন মুছিয়া ফেলিতে চায়। তাহার উচ্ছৃঙ্খলতায় কিন্তু অরণ্যের ভয়াল মহিমা নাই, আছে শুধু শ্রীহীন প্রাচুর্য। মৃত্তিকা যে দেশে দরিদ্র সেখানে তাহার কার্পণ্যই প্রকৃতিকে শাসনে রাখিয়া একটা সৌষ্ঠব দান করে। এখানকার সরস মাটিতে যেমন স্নেহের প্রাচুর্য, মানুষের শাসনেরও তেমনি অভাব। চারিদিকে ঝোপঝাড় আগাছার জঙ্গলের আড়ালে মানুষের বসতি অর্ধলুপ্ত হইয়া আছে। দিনের বেলায়ও সংকীর্ণ পথগুলি কেমন অন্ধকার মনে হয়। সমস্ত গ্রাম যেন কেমন অবসন্ন হইয়া ধুঁকিতেছে। তবু এই গ্রামটিই তাহার মনের কোথায় যে সাড়া জাগায় সে বুঝিতে পারে না।

দুপুর বেলায় গ্রামের পথ একেবারে নির্জন। অমলবাবুদের বাড়ি ঠিক কোনটা জানিবার জন্য প্রদ্যোত কাছাকাছি কাহাকেও দেখিতে পাইতেছিল না। শ্যাওলা-ঢাকা একটা পুকুরের পাশ দিয়া সরু পথ দুই দিকে চলিয়া গিয়াছে, কোন দিকে যাইবে ভাবিয়া প্রদ্যোত ইতস্তত করিতেছে, এমন সময়ে পুকুরের ভিতর একটি মাথা ভাসিয়া উঠিতে দেখা গেল। দশ-বারো বছরের একটি ছেলের মাথা। পুকুরের ভিতর ডুব দিয়া সে কি করিতেছিল, কে জানে। সাঁতার কাটিয়া তীরে যখন সে আসিয়া উঠিল তখন দেখা গেল, হাতে তাহার একটি বাঁশের চোঙা আছে, কিন্তু দেহে কোনো প্রকার বস্ত্রের বালাই নাই। এত বড় ছেলেকে উলঙ্গ দেখিয়া প্রদ্যোত নিজেই একটু অপ্রস্তুত বোধ করিতেছিল। কিন্তু ছেলেটির ভ্রূক্ষেপ নাই। নির্বিকার চিত্তে তীরে উঠিয়া সে বাঁশের চোঙাটার একটা মুখ আগে মাটি দিয়া বন্ধ করিয়া তাহার পর পাড়ের উপর রক্ষিত শুকনো কাপড়টা টানিয়া পরিবার ব্যবস্থা করিল।

এবার সুযোগ বুঝিয়া প্রদ্যোত জিজ্ঞাসা করিল—"অমলবাবুর বাড়ি কোথা বলতে পার, খোকা ?"

ছেলেটি নির্লিপ্তভাবে তাহার দিকে না চাহিয়াই বলিল—"জানি না!"

প্রদ্যোত একটু বিস্মিত হইল। খানিক আগে পথের এক কৃষকের কাছে সে যেরূপ নির্দেশ পাইয়াছে তাহাতে গ্রাম চিনিতে তাহার ভুল হইবার কথা নয়। অমলবাবু এই গ্রামে নিশ্চয় থাকেন। অথচ এই গ্রামেরই একটি ছেলে তাহা জানে না, এমন কি হইতে পারে ? তবু সে সন্দেহভরে একবার জিজ্ঞাসা করিল—"এ গ্রামের নাম দারবাক তো ?"

ছেলেটি তাহার বাঁশের চোঙা লইয়া আবার ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রদ্যোতের দিকে না ফিরিয়াই সে বলিল—"হ্যাঁগো!"

কাছাকাছি কেহ কোথাও নাই। ছেলেটির ঔদাসীন্য সত্ত্বেও প্রদ্যোতকে আবার জিজ্ঞাসা করিতে হইল, "অমলবাবু এই গাঁয়ে থাকেন না ?"

ছেলেটি চোঙা লইয়া এবার উঠিয়া আসিতে-আসিতে বিরক্তস্বরে বলিল, "বললাম না, জানি না !"

তবু প্রদ্যোতের তাহাকে ছাড়িলে চলে না। কাহারও সাহায্য না পাইলে, অমলবাবুর বাড়ি সে বাহির করিতে পারিবে না। অমলবাবু বেশির ভাগ কলিকাতায় থাকেন। সেই জন্য তাঁহার নাম গাঁয়ের এ ছেলেটির অপরিচিত হইতে পারে ভাবিয়া সে এবার অন্য উপায় অবলম্বন করিল। অমলবাবুর ভাই তাহাকে যে চিঠি লিখিয়াছে তাহাতে নাম লেখা ছিল—বিমল।

সমবয়সী ছেলের নাম হয়তো ইহার জানা সম্ভব বলিয়া প্রদ্যোত এবার জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, এ গাঁয়ে বিমল বলে একটি ছেলেকে চেন, তার দাদার খুব অসুখ !"

মুহূর্তে যেন ভোজবাজি হইয়া গেল। ছেলেটির মুখ উৎসুক-আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে উৎসাহভরে কাছে আসিয়া বলিল—"বারে ! বিমল তো আমার নাম, আমার ডাক নাম কিন্তু ন্যাড়া।"

হাসি চাপিয়া প্রদ্যোত বলিল, "আশ্চর্য তো ! আচ্ছা, তোমার দাদার নাম অমলবাবু নয় ?"

"তুমি নেবুদাকে খুঁজছ ? তাই বললেই তো হত !"

নাম ভুল করিবার অপরাধ স্বীকার করিয়া প্রদ্যোত বলিল—"তোমার দাদা কেমন আছেন ?"

বিমল বলিল—"ভালো," এবং তাহার পর দাদার অসুখের মতো সামান্য ব্যাপার নিয়া মাথা না ঘামাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি আমার

নাম জানলে কী করে ?" প্রদ্যোত এই দুরূহ প্রশ্নের যথাসম্ভব উত্তর দিবার চেষ্টা করিল—"তুমি চিঠিতে নাম লিখেছিলে, মনে নেই !"

বিমল কিন্তু আকাশ হইতে পড়িল ; বলিল—"বারে, আমি আবার চিঠি লিখলাম কবে ?" তাহার পর অসংকোচে প্রদ্যোতের পিঠে একটা কিল বসাইয়া বলিল—"আমার সঙ্গে ঠাট্টা হচ্ছে, না !"

অগত্যা পকেট হইতে চিঠিটা প্রদ্যোতকে বাহির করিতে হইল। কি ভাগ্যি চিঠিটা পকেটেই ছিল। নহিলে প্রমাণাভাবে বিমলের হাতে আজ কী লাঞ্ছনা পাইতে হইত, কে জানে !

বিমল সেটা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া বলিল—"দূর, ও তো ছোড়দির লেখা, আমি ওর চেয়ে ভালো লিখতে পারি। দিদিটা তো আচ্ছা পাজি, আমার নাম দিয়েছে !" বিমলের উপর এটা যে অত্যন্ত অবিচার করা হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিয়া প্রদ্যোত জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার দাদা এখন বেশ সেরেছেন তো ?"

"হ্যাঁ, আজ সকালে উঠে আমার কান মলে দিয়েছে তো !" দাদার সুস্থতার সব চেয়ে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দিয়া বিমল জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি দাদাকে দেখতে এসেছ বুঝি ! তুমি দাদার বন্ধু—না ?"

যে দাদা সুস্থ থাকিলেই কান মলিয়া দেয় তাহার বন্ধু বলিয়া পরিচয় দেওয়াটা গৌরবজনক কিনা বুঝিতে না পারিলেও, প্রদ্যোতকে কথাটা স্বীকার করিতে হইল।

কথা কহিতে-কহিতে তাহারা এক ধারের সরু পথ দিয়া অগ্রসর হইতেছিল। সামনে সুপারিগাছের সারের ফাঁক দিয়া একটি মাটির বাড়ি দেখা গেল।

বিমল উৎসাহভরে বলিল—"ওই তো আমাদের বাড়ি !" এবং তাহার

পর হঠাৎ প্রদ্যোতকে থামাইয়া গভীর কোনো গোপন কথা জিজ্ঞাসা করিবার মতো চুপিচুপি বলিল—"আচ্ছা, তোমার নাম কি ?"

নামটা শুনিয়া দুবার মুখে আবৃত্তি করিয়া বিমল যেন তেমন খুশি হইতে পারিল না—বলিল—"তোমার একটা ভালো নাম নেই—বেশ সোজা নাম !"

না ভাবিয়া-চিন্তিয়া নিজের নাম বাছিয়া লওয়ার জন্য এতদিনে বুঝি প্রদ্যোতের অনুশোচনা হইল। কে জানিত, বিমলের জিহ্বায় তাহার নাম একদিন উচ্চারণ করিতে কষ্ট হইবে—জানিলে সে সোজা নামই রাখিত।

সে হাসিয়া বলিল—"কি রকম নাম তোমার পছন্দ ?"

"বেশ সোজা নাম ! যেমন আমার নেবুদা, বামুনদের বাড়ির রাঙাদা।"

প্রদ্যোত বলিল—"তোমার যে নামে ইচ্ছে আমায় ডেক !"

বিমল প্রথমটা একটু অবাক হইল—"বারে তাও বুঝি হয় ! আমি নাম দিলে তুমি নেবে কেন ?"

প্রদ্যোত বলিল—"আমি যদি নিই তা হলে তো আর গোল নেই।"

"বেশ তাহলে তোমায় রাঙাদা বলব !"

প্রদ্যোত বলিল—"তাই !"

কেন যে সে নাম জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল তাহা বাড়ির নিকটে আসিয়া বোঝা গেল। বাড়ির বাহিরের পথের উপর পাঁচ-ছয় বছরের গুটি তিনেক ছেলে-মেয়ে খেলা করিতেছিল। অমলবাবুর বিধবা ভগ্নীর পুত্র-কন্যাই হইবে সম্ভবত। বিমলের সহিত অপরিচিত লোককে আসিতে দেখিয়া তাহারা খেলা ছাড়িয়া আগন্তুকের দিকে কৌতূহলভরে চাহিয়া ছিল। কিন্তু বোঝা গেল, বিমলের নব আবিষ্কারের দিকে

চাহিবার অধিকারও তাহাদের নাই। একজনের মাথায় একটা চাঁটি মারিয়া সে বলিল—"হাঁ করে চেয়ে আছিস কেন ?" মার খাইয়া ছেলে-মেয়েগুলা দূরে সরিয়া গেল। প্রদ্যোতের জামার আস্তিন ধরিয়া টানিতে টানিতে এবার বিজয়ী বীরের মতো বিমল আগাইয়া চলিল এবং দরজার কাছে দণ্ডায়মানা চৌদ্দ-পোনেরো বছরের একটি মেয়েকে চীৎকার করিয়া একেবারে চমকাইয়া দিয়া বলিল, "কে বলতো ছোড়দি ?"

কিন্তু বিমলের আড়ষ্ট জিহ্বা হইতে নামটা বাহির হইবার পূর্বেই ছোড়দি দরজা ছাড়িয়া সরিয়া গিয়াছে।

দরজার কাছে দাঁড়াইয়া পড়িয়া প্রদ্যোত বলিল, "যাও, তুমি দাদাকে খবর দাও গে যাও।"

প্রদ্যোতের এক হাত ধরিয়া টানিতে-টানিতে বিমল বলিল—"বাঃ, দাদা তো ওই ধারের ঘরে শুয়ে আছে, চল না।"

বোঝা গেল, খবর দেওয়ার প্রয়োজন সে স্বীকার করে না।

প্রদ্যোত হাসিয়া তাহাকে বাধা দিয়া বলিল—"খবর না দিয়ে কি যেতে আছে! যাও, তুমি বলে এস গে!"

অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিমলকে যাইতে হইল। তাহার নব-পরিচিত বন্ধুকে সকলের সামনে অপ্রত্যাশিত ভাবে উপস্থিত করাইবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া সে সুখী হয় নাই। একটু বিমর্ষ মুখেই সে ভিতরে গেল।

প্রদ্যোত বাহিরে দাঁড়াইয়া অমলবাবুদের বাড়িটি লক্ষ্য করিতেছিল। খড়ে ছাওয়া মাটির বাড়ি। তাহাও জীর্ণ দশায় পড়িয়াছে। বাহিরে লোকজন বসিবার একটা ব্যবস্থা বহু পূর্বে হয়তো ছিল, কিন্তু এখন সেখানে দু-একটি উইয়ে-খাওয়া ভগ্ন খুঁটি সম্বল করিয়া দাওয়াটি মাটির

একটা ঢিপির আকার ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে মাত্র। সমস্ত বাড়িটা ইটের দেওয়াল দিয়া ঘেরা ছিল। কিন্তু এখন দেওয়ালের অধিকাংশ জায়গাই ভাঙিয়া পড়িয়াছে এবং গায়ে তিনপুরু শ্যাওলা ধরিয়া ও অনেকপ্রকার গাছপালা জন্মিয়া চেহারা এমন হইয়াছে, যে তাহার সাবেকী ইষ্টকত্বের আর পরিচয় পাওয়া যায় না।

বিমল একটু বাদেই ফিরিয়া আসিয়া ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, "বললুম, খবর দিতে হবে না! দাদা কি বারণ করলে?"

প্রদ্যোত অনুমতি না পাইবার আশঙ্কাতেই যে ভিতরে খবর না দিয়া যাইতে চাহে নাই, এ-বিষয়ে বিমল নিঃসন্দেহ।

প্রদ্যোত হাসিয়া বলিল—"কি জানি যদি করতো!"

"হ্যাঁ, তা বুঝি করে! তুমি তো দাদার বন্ধু।"

এই যুক্তির সারবত্তা অস্বীকার না করিতে পারিয়াই বোধহয় প্রদ্যোত এবার নীরবে বিমলকে অনুসরণ করিল।

বাহির হইতে বাড়ির ভিতরকার অবস্থা সম্বন্ধে যে-ধারণা হইয়াছিল প্রদ্যোত দেখিল তাহা পরিবর্তন করিবার কোনো কারণ নাই। নাতিক্ষুদ্র একটি কাঁচা উঠানের দুই ধারে দুইটি চালা। একদিকের চালায় তিনটি ও অপর দিকের চালায় দুইটি ঘর থাকিবার কথা, কিন্তু সংস্কারাভাবে একদিকের চালা পড়িয়া গিয়া ঘরগুলি ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া গিয়াছে। অপর দিকের তিনটি ঘরের অবস্থাও বিশেষ ভালো নয়, তবে কোনোরকমে মাথা বাঁচাইয়া থাকা যায় বোধ হয়। জীর্ণ হইলেও বাড়িটি কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মাটির উঠানটি তক্‌তক্ খট্‌খট্ করিতেছে, কোথাও একটি আগাছার চিহ্ন নাই। দুই দিকের চালার পাশের জায়গায় কয়েকটি পেঁপে গাছ দেওয়া হইয়াছে; ভাঙা ঘরগুলির

গা বাহিয়া কুমড়া গাছের লতা উঠিয়াছে ঝাঁকড়াভাবে। তাহাদের তলা পর্যন্ত নিখুঁতভাবে পরিষ্কার।

বিমলের পিছু-পিছু একদিকের উঁচু দাওয়ায় উঠিয়া অমলের ঘরের দিকে যাইতে-যাইতে প্রদ্যোত দেখিল, মেটে ঘরের দেওয়াল হইতে, দাওয়ায় মেঝেতে ও সমস্ত জিনিসপত্রে এ-বাড়ির একটি নিপুণ গৃহস্থালীর ছাপ আছে। দারিদ্র্য ইহাদের স্পষ্ট, কিন্তু তাহাকে ইহারা নিজেদের শৈথিল্যে কুৎসিত হইতে দেয় নাই।

চালার একধারে অমলবাবুর ছোট একটি ঘর। দাওয়াটি ডান ধারে মোড় ফিরিয়া একটু প্রশস্ত হইয়াছে। সেই দাওয়ার উপরেই একটা মাদুর পাতিয়া গায়ে একটা কম্বল জড়াইয়া অমলবাবু অর্ধশায়িত অবস্থায় বসিয়া ছিলেন। প্রদ্যোতকে দেখিয়া প্রসন্নমুখে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন—“আসুন।”

প্রদ্যোত সেই মাদুরের একধারেই বসিয়া পড়িবার পর তিনি আবার বলিলেন—“আপনি যে কষ্ট করে এতদূর আসবেন তা ভাবিনি। আপনার পাঠানো টাকা তো আমরা পেয়ে গেছি।”

প্রদ্যোত কুণ্ঠিতভাবে হাসিয়া বলিল—“টাকা পাঠাবার পর আপনার কোনো খবর না পেয়ে একটু ভাবনা হল। চিঠিতে আপনার অসুখ যে রকম বেড়েছে খবর পেয়েছিলুম!”

অমলবাবু আর কিছু বলিলেন না, কৃতজ্ঞভাবে প্রদ্যোতের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

অমলবাবু একটু হয়তো সুস্থ হইয়াছেন; কিন্তু চেহারা দেখিয়া তাহা মনে হয় না। ক্ষুদ্রকায় মানুষটি এই ক'দিনের রোগ ভোগ করিয়া শীর্ণ হইয়া আরো যেন ছোট হইয়া গিয়াছে। সমস্ত মুখে অস্বাভাবিক রক্তহীনতার

পাণ্ডুরতা—চোখের কোণে গভীরভাবে কালি পড়িয়াছে। তাঁহার বসিবার ভঙ্গীটিতে পর্যন্ত দেহের গভীর অবসন্নতা পরিস্ফুট!

প্রদ্যোত একটু সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি এখন একটু ভালো বোধ করছেন?"

"ভালো?" অমলবাবু একটু হাসিলেন—"হ্যাঁ, একটু ভালো বই কি! তবে উঠে হেঁটে বেড়াতে এখনও বোধ হয় অনেক দিন যাবে! আপনারই মুশকিল! যদি অসুবিধে বোধ করেন, না হয় ওসব টিউশনি ছেড়ে দিন। যা হবার হবে।"

"না, না, আমি সে-কথা বলিনি। সত্যি কথা বলতে কি আমার টিউশনিগুলো না পেলে এ-সময়ে বিপদেই পড়তে হত।"

বিষয়টা পাল্‌টাইয়া প্রদ্যোত জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে আপনার চিকিৎসার একটু অসুবিধে হচ্ছে বোধ হয়।"

অমলবাবু ম্লান হাসিয়া বলিলেন—"না, অসুবিধে কিসের? যাদের উপায় আছে তারাই অভাব বোধ করে। ভালো চিকিৎসার উপায়ই নেই তো অসুবিধে।"

এ-কথার উপর বলিবার কিছু নাই। প্রদ্যোত চুপ করিয়াই ছিল। হঠাৎ বাড়ির স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দরজার কাছে এক তীক্ষ্ণ চীৎকার উঠিল। প্রথমটা সে সত্যই চমকাইয়া উঠিয়াছিল। অমলবাবু ক্লান্ত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"অসুবিধে শুধু এই!"

প্রথম বিস্ময়ের পর ব্যাপার বুঝিতে প্রদ্যোতের বিলম্ব হইল না। বুঝিয়া সে হাসিয়া ফেলিল।

অমলবাবুর সব চেয়ে ছোট ভাইটি এতক্ষণ আত্মপ্রকাশ করে নাই, এবার বিলম্বের ত্রুটি সুদ শুদ্ধ পূর্ণ করিয়া, তীক্ষ্ণ চীৎকারে বাড়ি মাথায়

করিয়া সে সবেগে দৌড়াইতে-দৌড়াইতে সামনের উঠানে আসিয়া দেখা দিল—তাহার পশ্চাতে ধাবমান বিমল। ছোট ভাইয়ের হাত হইতে, তাহার সশব্দ প্রতিবাদ ও অঙ্গসঞ্চালন উপেক্ষা করিয়া কী একটা জিনিস কাড়িয়া লইয়া বিমল চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল। অমলবাবু ডাকিলেন—"ন্যাড়া!" পলকের মধ্যে বিমলের আশ্চর্য রূপান্তর ঘটিয়া গেল; তাহার মুখে আর কথা নাই; দেহ নিশ্চল।

"শুনে যাও!"

অমলবাবুর কণ্ঠস্বর ক্ষীণ; কিন্তু দেখা গেল, তাহার প্রভাব অসাধারণ। বিমল সামান্য একটু প্রতিবাদ করিবার চেষ্টায় মুখ ভার করিয়া নিম্নস্বরে বলিল—"ও আমার লাট্টু চুরি করবে কেন? আমি বলে সেই কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলাম।"

"শুনে যাও!"

বিমল এবার বোধ হয় প্রতিবাদ নিষ্ফল বুঝিয়াই একলাফে দাওয়ায় উঠিয়া দাদার আদেশ প্রতিপালন করিল।

প্রদ্যোত অতিকষ্টে হাসি চাপিয়া কী জিজ্ঞাসা করিতে যাইতে ছিল, কিন্তু তাহার আগেই অমলবাবু বলিলেন—"কান ধরে ওই খুঁটির কাছে দাঁড়িয়ে থাক। কথা কইবে না।"

বিমল এ-আদেশ পালনে বিলম্ব করিল না—কিন্তু পৃথিবীতে ন্যায়-অন্যায় বিচারের একান্ত অভাব দেখিয়া, মুখ তাহার অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। দাদার লাঞ্ছনা স্বচক্ষে দেখিয়া খুশি হইয়া ছোট ভাইটি সরিয়া পড়িতে-ছিল। অমলবাবু ডাক দিয়া বলিলেন—"কমল! তুমিও এসে কান ধরে দাঁড়াও!"

মনে হইল বিমল সৃষ্টির গাঢ় তমিস্রায় একটু আলোর রেখা পাইয়াছে।

দুই ভাই খুঁটিতে ঠেস দিয়া কান ধরিয়া দাঁড়াইল। অমলবাবু অবসন্ন তিক্তস্বরে প্রদ্যোতের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"বাড়ির এই সুখ!"

প্রদ্যোত সত্যই এ-কথায় বিস্মিত হইল। এই প্রাণের প্রাচুর্যে উচ্ছল, আনন্দোজ্জ্বল ছেলেগুলির স্বাভাবিক আত্মপ্রকাশে সুখী না হইয়া কেহ কি অপ্রসন্ন হইতে পারে! এ তো অমলবাবুর সাধারণ রুগ্ন দেহের বিরক্তি নয়! মনে হয়, অমলবাবুর অন্তরের অনেক তলায় ইহার মূল আছে; তাঁহার দৃষ্টিই বিকৃত হইয়া গিয়াছে।

কান ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে-থাকিতেই হঠাৎ একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ঘটনা মনে পড়াতেই বোধহয় উত্তেজিত হইয়া বিমল বলিল—"আজ বড় বাড়ির পুকুরে ওরা একটা ভোঁদড় ধরেছে, নেবুদা।"

কমল দুই চোখ উত্তেজনায় বিস্ফারিত করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল—"আমিও দেখেছি, নেবুদা!" তাহার পর ক্ষণেকের জন্য কান হইতে হাত নামাইয়া, সে দুটো হাত যত দূর সম্ভব প্রসারিত করিয়া ভোঁদড়ের আকারটাও দেখাইয়া বলিল—"এই এত বড়!" গৌরব-হরণের চেষ্টায় বিমল চটিয়া গিয়া বলিল—"হ্যাঁ, তুই দেখেছিস্! বল্ দেখি, ভোঁদড় কেমন করে ডাকে?"

কমল হারিবার পাত্র নয়। গলার স্বর মিহি করিয়া সে একেবারে ভোঁদড়ের ডাক অনুসরণ করিয়াই ফেলিল—"মিঁউ!—ঠিক বেড়ালের মতো, জানো নেবুদা!"

ছোট ভাইকে জিহ্বা প্রদর্শন করিয়া বিমল তাহার উক্তিকে অসার প্রতিপন্ন করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, হঠাৎ দাদার চোখে চোখ পড়িয়া যাওয়ায় দুজনেরই স্খলিত হাত সবেগে কর্ণে উঠিয়া গেল এবং মুখ হইয়া গেল অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর।

পাঁচ

অমলবাবু একটু ভালো আছেন। তাহার সাহায্য করিবার বিশেষ কোনো প্রয়োজন নাই। তবু দুপুরে গৃহস্থের বাড়ি আসিয়া অমনি-অমনি চলিয়া যাওয়া যায় না। অমলবাবুর অনুরোধ প্রদ্যোত উপেক্ষা করিতে পারিল না। সে-বেলাটা তাহাকে থাকিয়াই যাইতে হইল।

তাহাকে রাখিবার গরজ বিমল-কমলেরই বেশি। দাদা অসুস্থ শরীর লইয়া খানিক বাদে প্রদ্যোতের স্নানাহারের বন্দোবস্ত করিবার আদেশ দিয়া ঘরে উঠিয়া যাইতেই শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাইয়া তাহারা একেবারে প্রদ্যোতকে পাইয়া বসিল। কমলের সহিত ভদ্রতা-সঙ্গত পরিচয়টা এখনও প্রদ্যোতের হয় নাই। কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়! প্রদ্যোতের কোলের কাছে সরিয়া আসিয়া, একেবারে তাহার জামার পকেটে হাত ঢুকাইয়া দিয়া কমল বলিল—"কী আছে দেখি তোমার পকেটে?"

বিমল হাঁটু গাড়িয়া পাশে আসিয়া বসিয়াছে। তৎক্ষণাৎ কমলের হাতটা সবেগে সরাইয়া দিয়া সে মুরুব্বির মতো বলিল—"যাঃ, অমন করে বিরক্ত করে নাকি!" এবং তাহার পরেই কী ভাবে বিরক্ত করিতে হয় তাহা প্রদর্শন করিবার জন্যই বোধহয় প্রদ্যোতের বুক-পকেট হইতে ব্যাগটা বাহির করিয়া লইয়া বলিল, "তোমার এতে অনেক পয়সা আছে বুঝি?"

প্রদ্যোত হাসিয়া বলিল—"হ্যাঁ।"

বিমল ব্যাগ সম্বন্ধে আরো কিছু তথ্য হয়তো সংগ্রহ করিত ; কমল বাধা দিয়া বলিল—"তুমি যে ব্যাগ নিলে !"

বয়সের মর্যাদায় তাহাকে তাচ্ছিল্য করিয়া বিমল বলিল—"বেশ করেছি। রাঙাদাকে কে বাড়ি চিনিয়ে এনেছে ?"

এ-কথা অস্বীকার করিতে না পারিয়া, কমল ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিল—"দাদাকে বলে দেব দেখবে ?"

পলকের মধ্যে ভোজবাজী হইয়া গেল। দেখা গেল : ব্যাগ যথাস্থানে ফিরিয়া গিয়াছে ও বিমল বলিতেছে—"আমি কি নিয়েছি নাকি ?"

স্নান করিতে যাওয়ার সময়ে দুই ভাইয়ের উৎসাহের আর সীমা রহিল না। বিমল ইতিমধ্যে রাঙাদার কানে-কানে অনেক মূল্যবান উপদেশ ও মধুর আশ্বাস দিয়া তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়াছে। সে সব উপদেশ ও আশ্বাসের মর্ম এই, যে স্নান করিতে যাইবার সময় কমলকে লইয়া যাওয়া কোনো মতেই যুক্তিসঙ্গত নয়। কমল ছেলেমানুষ, তাহার উপর সাঁতার জানে না। তাহাকে সামলাইতে গিয়া তাহাদের সমস্ত মজাটাই নষ্ট হইবে। কমল সঙ্গে না গেলে তাহারা একটু দূরে ভালো দীঘিতে স্নান করিতে যাইতে পারে। সেখানে সাঁতার কাটিবার অনেক বেশি সুবিধা। তাছাড়া সেখানে যে শাপলা ফুটিয়া আছে রাঙাদা দেখিলে অবাক হইয়া যাইবে ! তাহার কয়েকটা তুলিয়া আনিলেই বা ক্ষতি কি ? তাহার ভেঁটের খই যা মিষ্টি—একবার খাইলে আর ভুলিতে পারা যায় না। রাঙাদাকে তাহা খাওয়াইবার ব্যবস্থা আজ সে করিবে।

কিন্তু কমল সঙ্গে গেলে এসব কিছুই হইবে না ; যদি বা তাহাকে অত দূর লইয়া যাওয়া যায়, তাহা হইলেও তাহার স্বভাব অত্যন্ত মন্দ। শাপলা তুলিলে দাদাকে সে বলিয়া দিবেই। প্রদ্যোত একবার বুঝি বলিয়াছিল—"তুমি আবার স্নান করবে ? এখনি তো পুকুরে ডুবে এলে দেখলাম।"

এ-কথায় বিমলের ভাব দেখিয়া মনে হইল যে স্নান শব্দের অত সংকীর্ণ অর্থ ধরিয়া প্রদ্যোত একটা মারাত্মক ভুল করিয়াছে। জলে ডুব নানা কারণে দেওয়া যায়, কিন্তু সব সময়েই কি তাহা স্নানের গৌরব লাভ করে ? তাছাড়া সে তখন দেহই সিক্ত করিয়াছে—কাপড় তো তাহার শুষ্ক ছিল।

বিমলের চেষ্টা সত্ত্বেও, কিন্তু কমলকে ঠেকানো গেল না। মাথায় এক খামচা তেল দিয়া, কোথা হইতে একটা গামছা টানিয়া আনিয়া সে নাছোড়বান্দা হইয়া রাঙাদার সঙ্গ লইল।

সমস্ত কল্পনা এইভাবে মাটি করিয়া দেওয়ার জন্য বিমল তাহার উপর যে বেশ চটিয়াছে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ অবিলম্বেই পাওয়া গেল। অর্ধেক পথ বিমল ছোট ভাইকে ভৎর্সনা করিতে-করিতে গেল—"তুই কী জন্যে আসছিস ? তুই সাঁতার জানিস ?"

কমল বেশি কথা বলিয়া শক্তি ক্ষয় করা সম্ভবত পছন্দ করে না। রাঙাদার একটা হাত শক্ত করিয়া ধরিয়া সে তখন নীরবে চলিয়াছে।

বিমল এবার অন্য উপায় অবলম্বন করিল, বলিল—"চ-না, আজকে জলে একটা কুমির এসেছে।"

এবার কমলের মুখ ফুটিল—"ইস্ কুমির এসেছে ? কুমির এলে তো তোমাকেও ধরবে !"

"বড়দের ধরে না!" বলিয়া বিমল তাহাকে বৃথাই নিরুত্তর করিবার চেষ্টা করিল। তাহার বড়ত্ব সম্বন্ধে অপমানজনক সন্দেহ প্রকাশ করিয়া কমল বলিল—"তুমি কি বড় নাকি? তুমি কি নেবুদার মতো, রাঙাদার মতো বড়?"

একটা চড় দিয়াই এরূপ অন্যায় সন্দেহ নিরাকরণ করা উচিত কিন্তু রাঙাদা যে ভাবে তাহার হাত ধরিয়া আছে তাহাতে সে সাধু ইচ্ছা আপাতত স্থগিত রাখিতে হইবে বুঝিয়া বিমল বলিল—"তুই আজ আমার মাছ খেতে পাবি নে! আমি ধরেছি জানিস?"

"আমি খেতে চাই না, ও বানমাছ তো সাপ! সাপ আবার খায় নাকি!"

বিমলের বাঁশের চোঙার রহস্য এতক্ষণে পরিষ্কার হইল। সে তখন পুকুর হইতে চোঙার সাহায্যে বানমাছ ধরিয়া আনিয়াছে। আগের দিনই সে চোঙা পুতিয়া রাখিয়া আসিয়াছিল।

কমলকে কাবু করিবার জন্য বিমল হয়তো ভিন্ন পন্থা খুঁজিত, কিন্তু দুই ভাইয়ের বাক-যুদ্ধের অপ্রীতিকর পরিণতি আশঙ্কা করিয়া প্রদ্যোত হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল—"বিমল, তুমি স্কুলে যাও না?"

বিমল গম্ভীরমুখে বলিল, "কেমন করে যাব? আমার তো নাম কেটে দিয়েছে!"

"তোমার পড়তে ইচ্ছে করে না?"

"খু—ব করে!" বলিয়াই পরক্ষণে হাসিয়া ফেলিয়া বিমল বলিল—"দূর, মিছে কথা বললাম। আমার ভালো লাগে না পড়তে।"

তাহার পর সে গভীর দার্শনিক মন্তব্য করিল—"কী হবে পড়ে?"

ফিরিবার সময়ে কিন্তু দুই ভায়ে গভীর ভাব হইয়া গিয়াছে দেখা গেল! স্নান করিবার সময়ে দুই ভায়ে গামছা ছাঁকনি দিয়া গোটা কয়েক চিংড়ি

ধরিয়া ফেলিয়াছে। এ যে অত্যন্ত মহার্ঘ জিনিস এবং আপাতত খাওয়ার জন্য ব্যবহার করা যায় না, এ বিষয়ে দুজনের মধ্যে মতভেদ নাই এবং সেই জন্যই দু'জনের মিল হইয়াছে। শোনা গেল, এই চিংড়িই তাহারা গোপনে পালন করিয়া বড় করিয়া তুলিবে, কাহাকেও কিছু জানিতে দিবে না। তাহাদের যত্নে ও সেবায় ইহারাই যে একদিন মোচা-চিংড়ি হইয়া উঠিবে, ইহাতে তাহাদের কোনো সন্দেহ নাই। সেদিন দাদা ও দিদিরা কি আশ্চর্যই না হইয়া যাইবে। মোচা-চিংড়ি গড়িবার চক্রান্তে তাহারা রাঙাদাকেও টানিয়া লইল এবং শপথ করাইল, যে যত দিন চন্দ্র ও সূর্য আকাশে আলোক বিতরণ করিবে ততদিন রাঙাদা কাহারও কাছে এ-কথা প্রকাশ করিবে না। করিলে···

চোখ দুটা বড় করিয়া কমল বলিল—"করলে কী হবে জানো তো, রাঙাদা!"

না জানিয়াই সভয়ে রাঙাদা শপথ গ্রহণ করিল।

অমলবাবুকে অনেক বলিয়া কহিয়া প্রদ্যোত বিশ্রাম করিতে রাজী করাইয়াছে। তাহার খাওয়া-দাওয়ার তত্ত্বাবধান করিবার কোনো প্রয়োজন নাই তাছাড়া তাঁহার দুই ভায়েরাই তো আছে!

অমলবাবু অপ্রসন্নভাবে বলিয়াছেন—"ওরা তো আপনাকে জ্বালিয়ে খাচ্ছে! কী করব বলুন, ভয়ানক বেয়াড়া!"

প্রদ্যোত তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছে—"না, না, জ্বালাবে কেন! সত্যি বলছি, আমার অত্যন্ত ভালো লেগেছে!"

"রোজ সইতে হলে আর লাগত না।" বলিয়া অমলবাবু ঘরে ঢুকিয়াছেন।

অমলবাবু মা'র সহিত ইতিমধ্যে প্রদ্যোতের পরিচয় হইয়াছে। খাইবার সময়ে তিনিই সামনে আসিয়া বসিলেন। বয়স তাঁহার কম নয়; কিন্তু শোকে, তাপে, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামে বয়সের অপেক্ষা যেন একটু বেশি স্থবির হইয়া পড়িয়াছেন। দেখিয়া শ্রদ্ধার অপেক্ষা দুঃখই যেন বেশি হয়। বার্ধক্যের করুণ নিষ্ফলতা দারিদ্র্যের পটে মর্মান্তিক ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পাশাপাশি তিনটি পিঁড়ি পড়িয়াছে। চিংড়িমাছের চক্রান্ত সত্ত্বেও রাঙাদার কোন পাশে কে বসিবে তাহা লইয়া দুই ভায়ের মধ্যে বিচ্ছেদের সূচনা গোড়ায় একটু বুঝি দেখা দিয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা রফা হইয়া গিয়াছে। বিমল বসিয়াছে ডান দিকে এবং বামের স্থান অধিকার করিয়াছে কমল।

অমলবাবুর দিদি ভিতর হইতে দেখাইয়া দিতেছিলেন। পরিবেশন করিতেছিল তাঁহার ছোট বোন।

অমলবাবুর মা বলিলেন—"কিছুই নেই। তোমার খাওয়ার বড় কষ্ট হল।" কথাটা নিছক লৌকিকতা নয়। বলার ভিতর যে বেদনা আছে তাহা বুঝিতে পারিয়া প্রদ্যোত তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করিয়া বলিল—"না, না, কষ্ট কিছু নয়! আমরা এর বেশি আর কী খাই!"

অমলবাবুর মা নিজের কথার সূত্র ধরিয়াই বলিলেন—"লজ্জাও করে বাবা! অতিথি-সজ্জন এলেও একটার বেশি দুটো তরকারি সাজিয়ে দিতে পারি না, এতে বড় লজ্জা করে। অবস্থা আমাদের বরাবরই খারাপ, কিন্তু এমন আখ্‌খুটে দশা কখনো হয়নি!"

প্রদ্যোত অত্যন্ত কুণ্ঠিত বোধ করিতেছিল, এই সমস্ত দুঃখের কথা শোনাতেও লজ্জা আছে।

পাশ হইতে কমল হঠাৎ বলিল—"আমাদের একদিন লুচি হবে জানো রাঙাদা! সত্যিকারের লুচি, নেমন্তন্ন বাড়ির মতো!"

কমলের কথাও সেই একদিকেই যাইবে, কে জানিত!

বিমল তাহাকে ধমক দিয়া বলিল—"তুই থাম! তুই যেমন বোকা! লুচি হবে! লুচি সেই একবছর ধরে হচ্ছে আর তুই খাচ্ছিস!"

ছেলেমানুষের কথায় হাসাই উচিত; কিন্তু হাসির বদলে প্রদ্যোতের মুখ আরো গম্ভীর হইয়া উঠিল। থালার উপর মাথা নোয়াইয়া সে তখন একটা কী বাছিবার ভান করিতেছে।

অমলবাবুর মা এবার অন্য কথা পাড়িলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার দেশ কোথা বাবা?"

প্রদ্যোত আরো বিপদে পড়িল। এই অসুবিধার কথা তাহার মনে আগে উদয় হয় নাই। মিথ্যা কথা বলিতে তাহার ইচ্ছা করে না, অথচ একটা কিছু না বানাইয়া বলিলেও উপায় নাই। তাহার সত্য-কাহিনী সে কেমন করিয়া বলিবে? বলিলে বিশ্বাসই বা কে করিতেছে।

মনগড়া ভাবে প্রদ্যোত একটা উত্তর দিল। কিন্তু বৃদ্ধার কৌতূহল তাহাতে শান্ত হইল না। খুঁটিয়া-খুঁটিয়া তাহার সংসারের ও জীবনের অনেক কথাই তিনি জানিতে চাহিলেন। ভিতরে-ভিতরে অস্থির হইয়া উঠিয়া প্রদ্যোত কোনো রকমে তাহার জবাব দিয়া গেল এবং সব শুদ্ধ মিলিয়া নিজের যে-পরিচয় সে দিল তাহা ভুল ত্রুটি বাদ দিয়া অনেকটা এইরূপ। ছেলেবেলা হইতেই সে পিতৃমাতৃহীন। মানুষ হইয়াছে সে দূর সম্পর্কের মাতুলের আশ্রয়ে। বড় হইবার পর তাঁহারাও তাহাকে দূরে সরাইয়া দিয়াছেন। বলিতে গেলে এখন সে একরকম সহায়সম্বলহীন। নিজের পায়ে কোনো রকমে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছে মাত্র!

বৃদ্ধা হয়তো আরও কিছু জিজ্ঞাসা করিতেন, কিন্তু বিমল তাহাকে উদ্ধার করিল। অমলবাবুর ছোট বোন বুঝি অম্বল পরিবেশন করিতে আসিয়াছে। মুখে একগাল ভাত লইয়া জড়িত স্বরে হঠাৎ বিমল বলিল—"ছোড়দি তখন কী বলছিল জানো রাঙাদা? ছোড়দি, বলে দিই?" ছোড়দির চোখের তিরস্কার উপেক্ষা করিয়াই বিমল ঝড়ের বেগে বলিয়া গেল, "আমি তোমায় রাঙাদা বলি কিনা। ছোড়দি তখন তাই ঠাট্টা করছিল। বলছিল,—রাঙাদা আবার কি? রাঙা তো লাল, রাঙা আবার কালো হয় নাকি!"

কথা শেষ করিবার পূর্বেই গালের ভাত লইয়া বিমল বিষম খাইল। প্রদ্যোতের সঙ্গে মা তখন হাসিতেছেন।

পরিবেশনের পাত্র লইয়া সবেগে বিমলের ছোড়দি সেই যে ঘরে ঢুকিল তাহার পর আর তাহার দেখা নাই।

অনেকক্ষণ বাদে কোনো রকমে তাহাকে বাহির হইতে রাজী না করাইতে পারিয়াই বোধ হয় মাথায় ঘোমটা টানিয়া অমলবাবুর দিদিই আসিয়া পরিবেশনটুকু সারিয়া গেলেন।

বিকালবেলা বিদায় লইতে হইল। প্রদ্যোত সঙ্গে করিয়া কিছু টাকা আনিয়াছিল, অমলবাবুকে অনেক কষ্টে সে তাহা গ্রহণ করিতে রাজী করাইয়াছে। অমলবাবু কুন্ঠিতভাবে বলিয়াছেন—"এ-ধার আমি হয়তো শোধ করতেও পারব না।"

প্রদ্যোত অন্য কথা পাড়িয়া সে কথা চাপা দিয়াছে। "আপনি কতদিনে কলকাতায় যেতে পারবেন?"

"যে-রকম শরীর দুর্বল তাতে হপ্তা-দুএকের আগে কাজ করবার উপযুক্ত হব বলে মনে হয় না ; তবে সে শৌখিনতা তো আর আমাদের পোষায় না যে সুস্থ না হলে কাজ করব না। দিন দশেকের ভেতরেই বোধ হয় যাব। এ ক'টা দিন আপনি চালিয়ে নিন।"

প্রদ্যোত সেই আশ্বাস দিয়াই বাহির হইয়া আসিয়াছে। বিমল কমল কিন্তু তখনও তাহার সঙ্গ ছাড়ে নাই। প্রদ্যোতের যাওয়ায় তাহাদের একেবারেই সম্মতি নাই। থাকিবার অনুরোধ করিয়া হয়রান হইয়া অবশেষে বিমল তাহাকে প্রলোভনও দেখাইয়াছে যে, আজ রাত্রিটা থাকিলে কাল সকালে সে রাঙাদাকে আশ্চর্য এক জায়গায় মাছ ধরিবার জন্য লইয়া যাইতে প্রস্তুত। এ-জায়গা তাহার নিজের আবিষ্কার এবং অত্যন্ত গোপন। মাছ নাকি সেখানে এত প্রচুর ও এমন সুসভ্য, যে বঁড়শিতে টোপ পর্যন্ত লাগাইবার প্রয়োজন হয় না—অমনিই উঠিয়া আসে। রাঙাদার খাতিরে এরূপ স্থানের অধিকার ছাড়িয়া দিতেও সে প্রস্তুত।

প্রদ্যোত সস্নেহে হাসিয়া বলিয়াছে—"আমি তো ভাই মাছ ধরতে জানি না, আর একবার এসে তোমার কাছে শিখবো।"

নিতান্তই যখন রাঙাদা চলিয়া যাইবে তখন আর কি করিতে পারা যায়! দুই ভায়ে অনেক দূর পর্যন্ত প্রদ্যোতকে আগাইয়া দিয়া আসিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে বলিয়া প্রদ্যোত যখন কিছুতেই আর তাহাদের সঙ্গে আসিতে দিল না তখন এক জায়গায় দাঁড়াইয়া পড়িয়া বিমল বলিল—

"আবার আসবে তো রাঙাদা?"

"আসব ভাই!"

"কবে আসবে?"

কমল তাড়াতাড়ি বলিল—"কাল!"

"কাল নয় ভাই, পরে আসব! কেমন!"

"আচ্ছা!" বলিয়া বিমল চুপ করিল; তারপর হঠাৎ মুখ কাঁদকাঁদ করিয়া বলিল—"দূর, আমি বুঝি কিছু বুঝি না। সব মিথ্যে কথা! তুমি আর আসবে না!"

মনে-মনে কথাটাকে নিতান্ত সত্য বলিয়া জানে বলিয়াই বোধ হয় প্রদ্যোতের মুখ দিয়া কিছুতেই আর মিথ্যা আশ্বাস বাহির হইতে চাহিল না। কাতরভাবে খানিক তাহাদের দিকে নীরবে তাকাইয়া থাকিয়া, সে হঠাৎ পিছু ফিরিয়া জোরে-জোরে পা ফেলিয়া অগ্রসর হইয়া গেল।

দুই ভাই হাত ধরাধরি করিয়া তখনও বিষণ্ণ মুখে সেদিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

ছয়

প্রদ্যোত কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছে। অমলবাবুর বদলে টিউশনি করিতে-করিতে নিজের জন্য কাজও খুঁজিতেছে। অমলবাবু শীঘ্রই সারিয়া ফিরিবেন, তাহার পর নিজের জীবিকানির্বাহের একটা উপায় তো তাহাকে করিতে হইবে। আপাতত নব-জীবনের বড়-বড় সমস্যা এই প্রাণধারণের স্থূল প্রয়োজনে চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

এক এক সময়ে সে অবাক হইয়া ভাবে যে আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাহার আর যেন কোনো প্রভেদ নাই। তাহাদের মতোই দিন-যাপনের স্থূল চিন্তাতেই সে তন্ময় হইয়া আছে। তাহার বাহিরে কিছু ভাবিবার সময়ই তাহার কই? বিস্মৃতির যে-প্রাচীর তাহার অতীত ও বর্তমানের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য ভাবে দাঁড়াইয়া আছে তাহার কথা সব সময়ে তাহার স্মরণও থাকে না। তাহার পাশে তাহারই মতো অভাবের দারিদ্র্যের ভ্রূকুটির তলে নিত্য যাহারা বাস করে তাহারাও, অতীত একটা কিছু থাকিলেও, স্মরণ করিবার সময় পায় কোথায়? সে হিসাবে তাহাদের সহিত প্রভেদ প্রদ্যোতের বুঝি নাই!

কিন্তু প্রভেদ একটু আছে বই কি! অমলবাবুর ছোট ভাই দুটির কথা তাহার মনে পড়িয়া যায়। একদিনে তাহারা অমন করিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিবে কে জানিত! অসহায় লতার মতো তাহার ক্ষুধিত মন একটা অবলম্বনের জন্য ব্যাকুল হইয়া আছে, তাহার চারি-

পাশের শূন্য আকাশে সে হাতড়াইয়া ফিরিতেছে একটা আশ্রয়ের জন্য ! নিষ্ফল জানিয়াও এতটুকু তৃণও সে উপেক্ষা করিতে পারে না। অত সহজে তাই বুঝি ওই দুটি শিশু তাহার হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। কিন্তু সে মনে-মনে জানে, তাহার এ-আকুলতা নিষ্ফল। ভাগ্য তাহাকে দুর্নিবার স্রোতে ভাসাইয়াছে ; তীরের সহিত মিতালি করিয়া শিকড় গাঁথিবার চেষ্টা তাহার বৃথা। মাটির স্থির ধ্রুব আশ্রয় তাহার জন্য নহে, চারিটি শিশুহাতে কূলের মৃত্তিকা তাহাকে যত মধুর হাতছানি দিয়াই ডাকুক না কেন, নদীস্রোত তাহাকে দাঁড়াইবার অবসর দিবে না! তাহাকে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতে ভাসিয়া যাইতে হইবে। প্রভেদ এইখানে, এই নিরাশ্রয়তায় !

অমলবাবুর দিন দশেকের ভিতর ফিরিবার কথা ছিল ; তাঁহার ফিরিবার দিন তিনেক আগেই অপ্রত্যাশিতভাবে প্রদ্যোত একটা কাজ পাইয়া গেল। কাজ অবশ্য ছেলে পড়াইবারই, কিন্তু মাহিনা ভালো : আপাতত অন্নচিন্তাটা তাহার ঘুচিবে। মফঃস্বলের এক ধনী জমিদার তাঁহার ছেলেদের পড়াইবার জন্য একজন গৃহশিক্ষক চান। অমলবাবুর বদলে যে ছাত্রদের সে পড়াইতেছে তাহাদেরই একজনের সুপারিশে কাজটা তাহার জুটিয়া গেল। দিন সাতেকের ভিতরই রওনা হইতে হইবে।

প্রদ্যোত ঠিক করিল, অমলবাবু ফিরিয়া আসিলেই তাঁহাকে তাঁহার কাজ বুঝাইয়া দিয়া সে চলিয়া যাইবে। যাওয়া সম্বন্ধে তাহার মনে দ্বিধা কিছুই নাই। তাহার কাছে সমস্ত দেশই সমান। কিন্তু অমলবাবুর হইল কী ? দশ দিনের জায়গায় পনেরো দিনেও তিনি ফিরিলেন না। প্রদ্যোত এই পাঁচটা দিন কোনো রকমে আশায়-আশায় অপেক্ষা করিয়াছে। অমলবাবু যে-রকম অসুস্থ হইয়াছিলেন তাহাতে দশ দিনের জায়গায় কিছু বেশি

সারিতে সময় লাগা বিচিত্র নয়। কিন্তু পনেরো দিনের পরও অমলবাবুকে আসিতে না দেখিয়া সে চিন্তিত হইল। তাহার নিজেরও আর অপেক্ষা করিবার সময় নাই। কাজ পাওয়া যে কত কঠিন এই কয়দিনে সে তাহা বেশ ভালো করিয়াই বুঝিয়াছে। তাহার অবহেলায় এ-কাজ ফসকাইলে কী যে তাহার অবস্থা হইবে কিছুই বলা যায় না।

সে অমলবাবুকে জরুরি একটা চিঠি দিয়া সমস্ত বিষয় পরিষ্কার করিয়া লিখিল এবং সেই সঙ্গে জানাইল যে অমলবাবু দু'এক দিনের ভিতর না ফিরিলে বাধ্য হইয়া তাঁহার টিউশনিগুলি ছাড়িয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে হইবে। যদি অমলবাবু কোনো কারণে এখনও আসিতে না পারেন, তাহা হইলে আর কাহাকেও বদলি দিবার ব্যবস্থা তিনি যেন করেন।

প্রদ্যোতের কর্মস্থলে যাইবার শেষ দিন আসিয়া পড়িল। আশ্চর্যের বিষয়, তবু অমলবাবুর দেখা নাই। প্রদ্যোতের চিঠির উত্তরে একটা চিঠিও তিনি দেন নাই। প্রদ্যোত এবার একটু অপ্রসন্নই হইয়াছিল অমলবাবুর উপর। বিপদের সময়ে তাঁহার দরুন যে সাহায্য প্রদ্যোত পাইয়াছিল তাহার জন্য সে কৃতজ্ঞ; সে-কৃতজ্ঞতার ঋণ সে সামান্যভাবে শোধ করিবার চেষ্টাও করিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া সে আর নিজের ভবিষ্যতকে বিপন্ন করিয়া তাঁহার জন্য বসিয়া থাকিতে পারে না। অমলবাবু সেরূপ আশা করিয়া থাকিলে অন্যায়ই করিয়াছেন। তাহার চিঠির উত্তরে অন্তত একটা চিঠি তাঁহার লেখা উচিত ছিল। এই দায়িত্বহীনতাকে প্রদ্যোত কোনো রকমেই ক্ষমা করিতে পারিতেছিল না।

মনে-মনে অমলবাবুর উপর অপ্রসন্ন হইলেও, তাঁহার কাজ ফেলিয়া চলিয়া যাইতে কোথায় প্রদ্যোতের একটু বাধিতেছিল। তাহার অবহেলায় কাজগুলি গেলে অমলবাবুর সংসারের যে অবস্থা হইবে তাহা সে কল্পনা

করিতে পর্যন্ত সাহস করে না। নিজেকে অবশ্য সে বুঝাইয়াছে, যে অমলবাবু যদি নিজের ক্ষতি ইচ্ছা করিয়া করেন, তাহা হইলে তাহার আর অকারণে মাথাব্যথা কেন! সে যতদূর সম্ভব সাহায্য করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এখন নিজের কাজ রাখা না-রাখা অমলবাবুর হাতে। কিন্তু বুঝাইবার এত চেষ্টা সত্ত্বেও মনে একটা খোঁচ যেন থাকিয়া যায়। অকারণে কি রকম একটা অশান্তি বোধ হইতে থাকে।

তবু সারা সকালটা প্রদ্যোত যাইবার উদ্যোগ আয়োজনই করিল। ইহার মধ্যে আর একখানা চিঠি লিখিয়া সে অমলবাবুকে পাঠাইয়া দিয়াছে। অমলবাবুর পত্র না পাওয়ায় সে যে চিন্তিত এবং আর অপেক্ষা করিলে তাহার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়াই যে তাহাকে যাইতে হইয়াছে, এ-কথা জানাইয়া সে অমলবাবুর কাছে বিদায় চাহিয়াছে। কমল ও বিমলের কথা জিজ্ঞাসা করা নিষ্প্রয়োজন, তবু সে নিচে এক ছত্রে তাহাদের কথা না লিখিয়া পারে নাই।

চিঠি ফেলিয়া দিয়া আসিয়া, যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ করিবার সময়ে তাহার মনে নূতন এক খট্‌কা লাগিল। অমলবাবু নূতন করিয়া আবার অসুখে পড়েন নাই তো? সেইজন্য চিঠির উত্তর আসে নাই, এমনও তো হইতে পারে! জোর করিয়া এই নূতন সন্দেহকে মন হইতে সে সরাইয়া দিবারই চেষ্টা করিল। এই সন্দেহ পোষণ করিয়া, যাইবার আয়োজন করিতে তাহার হাত যেন উঠিতে চায় না। কিন্তু এ তাহার নিশ্চয়ই অমূলক ভয়, অমলবাবু নিশ্চয়ই ভালো আছেন। সে জন্য ভাবিবার তাহার প্রয়োজন নাই। আর ভাবিয়াই বা সে কী করিবে? অমলবাবু যদি আবার অসুস্থ হইয়া পড়িয়া থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহার জন্য সে নিজের ক্ষতি তো এখন করিতে পারে না। তাহাকে যাইতেই

হইবে। জিনিসপত্র গুছাইয়া বোর্ডিং-এর বিল সে চুকাইয়া দিতে গেল।

ম্যানেজারবাবু ইতিমধ্যে তাহার যাত্রার উদ্দেশ্য, গন্তব্য স্থান ইত্যাদি খুঁটিয়া-খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইয়াছেন। তাঁহার স্বভাবই তাই। তিনি প্রায়ই গর্ব করিয়া বেড়ান, যে বোর্ডিং হইলে কি হয় তাঁহার তত্ত্বাবধানে গৃহের অভাব কাহাকেও বোধ করিতে হয় না। বোর্ডারদের শুধু পয়সা নয়, তাহাদের সুখ-দুঃখের ভাগও তিনি লইয়া থাকেন। শুধু ব্যবসার সম্পর্ক সকলের সহিত রাখিতে পারেন না বলিয়া কি ভাবে তিনি কতবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, সে-কথাও তিনি সবিস্তারে বলিতে ছাড়েন না। তাঁহার এই ব্যবসার অতিরিক্ত সম্পর্ক পাতাইবার চেষ্টায় ইতিপূর্বে প্রদ্যোতকে বিব্রত হইতে হইয়াছে অনেকবার।

আজ প্রদ্যোতের দেওয়া টাকাগুলি একবার টেবিলে, একবার পেপার-ওয়েটের উপর ও তাহার পর আর একবার মেঝেতে ঠুকিয়া-ঠুকিয়া বাজাইয়া লইয়া তিনি সহাস্যে বলিলেন, "চললেন তাহলে আজই !"

রসিদটা লইয়া প্রদ্যোত সরিয়া পড়িতে পারিলে বাঁচে। এ-কথার সে উত্তর দিল না।

ম্যানেজারবাবুর কিন্তু অত শীঘ্র রসিদ দিবার কোনো তাড়া নাই। ড্রয়ার খুলিয়া আর একবার টাকাগুলি দু'পিঠ উলটাইয়া যাচাই করিয়া লইয়া একটি ক্যাশবাক্সে রাখিতে-রাখিতে তিনি বলিলেন—"কী বলব মশাই ! এতকাল ধরে বোর্ডিং চালাচ্ছি—জানেন তো আমাদের এটা হচ্ছে ওল্ডেস্ট বোর্ডিং হাউস ! ওল্ডেস্ট এ্যাণ্ড বেস্ট—কলকাতায় যখন ঘোড়ার ট্রাম চলত তখন থেকে আমাদের বোর্ডিং হাউস চলছে—তখন অবশ্য

আমি ছিলাম না—আমার মামা ছিল ম্যানেজার—আসলে মামাই এটা স্টার্ট করে কি না! তারপর, মামার ছেলেপুলে নেই—ডায়াবিটিসের ব্যামো বলে ভালো করে দেখতে শুনতে পারে না—আমি তখন পাশ করে বসে আছি কাজ-কর্মের অভাবে—আর কাজ-কর্ম বলতে চাকরি—সে মশাই আমি তখনই ঠিক করেছিলাম করব না বলে। চাকরি আমাদের তিন পুরুষে কেউ করেনি। আমাদের বংশে—" ঘোড়ার ট্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া পারিবারিক ইতিহাসের কোন মহামূল্য পৃষ্ঠায় ম্যানেজারবাবু যে তাঁহার বক্তৃতাকে টানিয়া লইয়া যাইতেন তাহা বলা যায় না। কিন্তু হঠাৎ প্রদ্যোতের অস্থিরতাটা বোধহয় তাঁহার চোখে পড়িল, এবং তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দেওয়া ধনুকের ছিলার মতো পূর্বের স্থানে ফিরিয়া গিয়া তিনি বলিলেন—"হ্যাঁ, যা বলছিলাম, এতকাল ধরে বোর্ডিং চালাচ্ছি মশাই, কিন্তু এখনও মনটা শক্ত করতে পারলাম না। দু'দিনের জন্যে কেউ এলেও মায়া পড়ে যায়—ছেড়ে যাওয়ার সময় মনে হয় যেন কতদিনের আত্মীয় চলে যাচ্ছে। মনকে বলি, তোর অত কেন রে বাপু! তুই বোর্ডিং চালাস, খেতে দিবি থাকতে দিবি, পয়সা নিবি—ব্যাস্ ফুরিয়ে গেল! কে এল, কে গেল, তাতে তোর কি! বোর্ডিং তো বোর্ডিং, মায়া করে এই দুনিয়াতেই কি কিছু লাভ আছে—ধরে রাখতে পারিস কাউকে! তাই আমাদের দাদাঠাকুর বলত না? দাদাঠাকুরকে আপনারা দেখেননি—ওই আপনাদের ঘরেই থাকত। সন্ন্যাসী মানুষ—কোনো ঝঞ্ঝাট নেই—ভারি ভালো লোক ছিল! সে-ই বলতো—বোর্ডিং নয় রে বেটা, বোর্ডিং নয়—ভালো করে চেয়ে দেখ, ম্যানেজারি করেই উদ্ধার হয়ে যাবি। কোথা থেকে এসে খাতায় নাম লেখাচ্ছে—আর নাম কাটিয়ে কোথা চলে যাচ্ছে মেয়াদ

ফুরুলে! ভাব দেখি ব্যাপারখানা!—কিন্তু বললে কী হবে—মায়া কি যায়! কেউ যেতে চাইলেই মনটা কেমন করতে থাকে!"

এই অনুভূতির মর্ম খানিকটা বুঝিতে পারিয়া প্রদ্যোত বলিল, "আমার রসিদটা না হয় পরে দেবেন!"

"না, না, এই যে দিচ্ছি, নিয়েই যান না।" বলিয়া ম্যানেজার মহাশয় রসিদের খাতা বাহির করিলেন এবং কলমটা দোয়াতে ডুবাইয়া রাখিয়া হতাশভাবে বলিলেন—"আবার কখনো দেখা হবে কিনা ভগবান জানেন! কিন্তু এই কথা রইল, যদি কখনো এইদিকে আসেন, পায়ের ধুলো দিতে ভুলবেন না যেন।"

কলমটা দোয়াত হইতে উঠাইয়া রসিদের খাতার উপর লিখিতে গিয়া হঠাৎ আবার তিনি বলিলেন—"এবার যখন ফিরবেন তখন কি আর এ-রকম হোটেলে আপনার রুচবে মশায়—তখন আপনার ভোলই যাবে বদলে।"

বিরক্তি সত্ত্বেও হঠাৎ তাহার সম্বন্ধে ম্যানেজার মশাইয়ের এই অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রদ্যোত একটু বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া পারিল না।

ম্যানেজারবাবু বলিলেন—"আমি তো আগেই বলেছি মশাই, এবার আপনার একটা হিল্লে হয়ে গেল! ছেলে পড়ানো হলে কি হয় বড় ভালো কাজ বাগিয়েছেন। ওখানে ছুঁচ হয়ে ঢুকে একেবারে ফাল হয়ে বেরুতে পারবেন। আর আমার নিজের চক্ষেই যে দেখা—আমাদেরই এক জ্ঞাত-ভাই কোন পাঠশালা না কোথায় মাস্টারি করে দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পেত না পেট ভরে। তার পর একটা পাণ্ডব-বর্জিত দেশে জমিদারের ছেলেকে পড়াবার মাস্টারি পেয়ে গেল। সবাই মানা করেছিল যেতে; বলেছিল, কী হবে গিয়ে সেই বন-দেশে। কিন্তু

মানা শোনেনি বলেই তো আজ কলকেতায় দুখানা বাড়ি তুলে দুখানা মোটর হাঁকিয়ে বেড়াচ্ছে। মাস্টারি থেকে সেরেস্তায় ভালো চাকরি, তারপর একখানা তালুকের নায়েবী, তারপর স্টেটের ম্যানেজার, এ তো আমাদের চোখের ওপর হল বছর কয়েকের ভেতর। পাঁচ বছরে ফুলে লাল হয়ে গেল।"

ম্যানেজারবাবু হঠাৎ চোখ টিপিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন—"অবশ্য ভেতরে ব্যাপার আছে মশাই! বড়-বড় ঘরের নোংরা ব্যাপার আমাদের বলতেও বাধে···"

প্রদ্যোতের মুখের দিকে চাহিয়া কি ভাবিয়া তিনি সেই উপাদেয় অবর্ণনীয় ব্যাপার বলার লোভ সম্বরণ করিলেন। বলিলেন—"এই যে দিচ্ছি আপনার রসিদ লিখে! আপনার তেমন তাড়াতাড়ি তো নেই। সেই একটার তো গাড়ি?"

প্রদ্যোত এতক্ষণ ম্যানেজারবাবুর অর্ধেক কথাই শোনে নাই। নিজের মনে সে অন্য একটা কথা গভীর ভাবে ভাবিতেছিল। ম্যানেজারবাবুর প্রশ্নে হঠাৎ সচেতন হইয়া সে বলিল—"না, আমি এখুনি বেরুব।"

"এখুনি বেরুবেন? এখন তো মোটে দশটা! এই না একটায় গাড়ি বললেন?"

প্রদ্যোত সংক্ষেপে বলিল—"আমি এখন অন্য যায়গায় যাচ্ছি। কাজের জায়গায় আজ যাব না।"

"আজ যাবেন না!" ম্যানেজারবাবু রসিদটা তখন লিখিয়া ফেলিয়াছেন। সেদিকে হতাশভাবে তাকাইয়া অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিলেন—"আমায় আগে তা বলতে হয়।"

"তাতে আর কি হয়েছে! আপনার প্রাপ্য তো চুকে গেল! কাল সকালে এসে জিনিসপত্রগুলো শুধু নিয়ে যাব।"

ম্যানেজারবাবুর মুখের ভাব বদলাইয়া গিয়াছে। ঈষদুষ্ণস্বরে বলিলেন—"জিনিসপত্রগুলো তো থাকবে! একটা দিন আমার ঘরও থাকবে জোড়া হয়ে!"

প্রদ্যোত বিরক্তি দমন করিয়া বলিল—"সে একটা দিনের ভাড়া না হয় কেটে নিন।"

ম্যানেজারবাবু তথাপি অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন—"তা বলছেন যখন না হয় নিচ্চি। কিন্তু রসিদের একটা পাতা তো নষ্ট হল।"

সাত

কাজে যোগ দিবার পূর্বে আরও তুইদিন সময় চাহিয়া ভাবী মনিবের কাছে একটা চিঠি লিখিয়া প্রদ্যোত দারবাক রওনা হইল। ম্যানেজারের ঘরে বসিয়া ইহাই সে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিল। সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিয়া চলিয়া যাওয়া যে তাহার পক্ষে মোটেই অন্যায় নয় মনকে নানাভাবে এ-কথা বুঝাইয়াও সে ইতিপূর্বে স্বস্তি পাইতেছিল না। তাহার নবজাগ্রত জীবনে এই প্রথম দ্বন্দ্ব, প্রথম কর্তব্যের সমস্যা আসিয়া দেখা দিয়াছে। এই প্রথম পরীক্ষাতেই সে কি হার মানিবে? অমলবাবু সত্যই তাহার কেহ নয়, কোনো কর্তব্যই তাহার এ-ক্ষেত্রে নাই, এ-কথা বলিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়া তাহার চলে না। আত্মীয়-তার গূঢ়তম অর্থেও অমলবাবুকে সে বাদ দিতে বুঝি পারে না। নূতন জীবনে তাঁহারাই তো তাহার প্রথম আত্মীয়। তাঁহাদের সহিতই তাহার মনের প্রথম স্নেহের গ্রন্থি পড়িয়াছে। নিজের কাজের ক্ষতি হয় হোক, অমলবাবুর খবর একবার নিজে তাহাকে গিয়া লইয়া আসিতেই হইবে। সে বুঝিয়াছে, যে নূতন জীবনের প্রারম্ভে এই খুঁতটুকু রাখিয়া গেলে কোনোমতেই সে শান্তি পাইবে না। আর ক্ষতি তাহার সত্যই কিছু নাও হইতে পারে। তুদিনের বিলম্বে হয়তো এমন কিছু আসিয়া যাইবে না।

গ্রামের পথ এবার তাহার চেনা। অমলবাবুদের বাড়ি পৌছাইতে বিলম্ব

হইল না। পথে যাইতে-যাইতে বিমল-কমলের সহিত তাহার আগের বারের বিদায়ের কথা মনে হইতেছিল। সত্যই আবার এ-গ্রামে তাহাকে ফিরিতে হইবে, এ-কথা সে ভাবে নাই।

মেঘলা আকাশ গ্রামের উপর নত হইয়া আছে। সেই বিষণ্ণ আলোয় ঝোপঝাড় জঙ্গলে ভরা গ্রাম যেন আরো পরিত্যক্ত, আরো জনহীন বলিয়া মনে হয়। যে পুকুরের ধারে বিমলের সহিত প্রথম পরিচয় হইয়াছিল সেখানে আসিয়া প্রদ্যোত উৎসুকভাবে একবার জলের দিকে না চাহিয়া পারিল না। যেন বিমলকে আজও সেখানে দেখা যাইতে পারে। বিমল অবশ্য সেখানে নাই। বাড়ির কাকাকাছি আসিয়াও দুই ভায়ের কাহাকেও প্রদ্যোত দেখিতে পাইল না। সম্ভবত তাহারা অন্য দিকে কোথাও গিয়াছে। সুশীল সুবোধ বালকের মতো তাহারা যে এই মেঘলা দুপুরে ঘরে বন্ধ হইয়া আছে, এ-কথা প্রদ্যোত বিশ্বাস করিতে পারে না।

অমলবাবুদের বাড়ির দরজা বন্ধ। প্রদ্যোত বাহির হইতে শিকলি নাড়িয়া, অমলবাবুর নাম ধরিয়া কয়েকবার ডাকিল। কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

দরজার শিকলি আরো জোরে নাড়িয়া, গলাটা আর একটু চড়াইয়া দেওয়ার পর ভিতরে পদশব্দ পাওয়া গেল। কে যেন দরজা খুলিতে আসিতেছে।

প্রদ্যোত নিজের মনে একটু হাসিয়া বলিল—"কে বিমল নাকি?" কিন্তু কোনো প্রত্যুত্তর নাই। দরজটা তাহার পর খুলিয়া গেল বটে, কিন্তু যে খুলিয়াছে তাহাকে দেখা গেল না! দরজার পাশে সে নিজেকে গোপন করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

একটু বিস্মিত হইয়া প্রদ্যোত জিজ্ঞাসা করিল—"অমলবাবু বাড়ি আছেন তো ?" এবারও খানিকক্ষণ কোনো উত্তর নাই ! অমলবাবুর ভগিনীদের মধ্যে কেহ আসিয়া দরজা খুলিয়া দিয়াছে বুঝিয়া, প্রদ্যোত নিজের পরিচয়স্বরূপ বলিল—"আমি অমলবাবুর বন্ধু, কলকাতা থেকে আসছি। এর আগে আর একদিন এসেছিলাম।"

এবার দরজার ধার হইতে মৃদুকণ্ঠে শোনা গেল—"আপনি একটু দাঁড়ান।" অমলবাবুর ছোট বোনই দরজা খুলিতে আসিয়াছিল। উঠান পার হইয়া তাহাকে সঙ্কুচিতভাবে বড় চালার দিকে যাইতে দেখা গেল। প্রদ্যোতের সমস্ত ব্যাপারটা কেমন একটু অদ্ভুত লাগিতেছিল। অমলবাবুর অসুখ কি তাহা হইলে আরও বাড়িয়াছে, না তিনি কোনো কাজে কোথায় গিয়াছেন ! বিমল-কমলকে এ-সময়ে পাইলে অনেকটা সুবিধা হইত। কিন্তু তাহাদেরও দেখা তো নাই। মেয়েটি কেন যে তাহাকে দাঁড়াইতে বলিয়া চলিয়া গেল কিছুই বুঝিতে না পারিয়া প্রদ্যোত একটু বিমূঢ় হইয়া রহিল। বাড়িটা অস্বাভাবিক রকম স্তব্ধ। ঠিক দ্বিপ্রহরের গ্রামের স্তব্ধতা এ নয়, ইহার পিছনে কিসের যেন একটা দুর্জ্ঞেয় অস্বস্তিকর উপস্থিতি আছে।

দরজার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে-থাকিতে প্রদ্যোত ক্রমশই অস্থির হইয়া উঠিতেছিল। ভিতরে কোনো সাড়া শব্দ নাই। মেয়েটি বাড়ির ভিতর যেন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। প্রদ্যোতের মনে হইল, অমলবাবু বাড়ি থাকিলে তাহাকে ভিতরে লইয়া যাইবার এত বিলম্ব হইবার তো কারণ নাই। অমলবাবু যে ভিতরে নাই, এমন কথাও কিন্তু ভাবা যায় না। মেয়েটি তাহা হইলে সেই কথা আগেই জানাইতে পারিত।

সংশয়-দোলায় কিন্তু আর তাহাকে দুলিতে হইল না। নিস্তব্ধ বাড়িটা

হঠাৎ যেন ঘনছায়াচ্ছন্ন আকাশের তলায় কাতরাইয়া উঠিল। অমলবাবুর মা স্খলিতপদে দাওয়া হইতে নামিয়া আসিতেছেন। তাঁহার আর্তনাদের শব্দ প্রদ্যোতকে একমুহূর্তে বিস্ময় বেদনায় স্তব্ধ বিমূঢ় করিয়া দিল। এই ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার কথা তাহার কল্পনাতেও স্থান পায় নাই। এখনও তাহার সমস্ত মন দিয়া এ-কথায় বিশ্বাস করিতে সে যেন পারিতেছে না। কিন্তু অমলবাবুর বৃদ্ধা মা'র আর্তনাদের ভিতর সন্দেহের অবসর আর যে নাই। প্রদ্যোত যেন আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিতেছিল না। একবার তাহার ইচ্ছা হইল, সেইখান হইতেই সে পলাইয়া যায়। এই শোকবিহ্বল অসহায় পরিবারটির সম্মুখীন হইতে পারিবে না। কিন্তু পলাইবার আর উপায় নাই। বৃদ্ধা দূর হইতে চিৎকার করিতে-করিতে আসিতেছিলেন—"আমার নেবুকে দেখতে কে এসেছে গো! ওগো দেখে যাও!"

মা'র সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া কমল ও বিমল ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। তাহাদেরও চোখে অশ্রু, কিন্তু সেই অশ্রু-কাতর মুখের উপরেই রাঙাদাকে দেখিতে পাওয়ায় যে আনন্দ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে চাহিতেছে তাহা দেখিয়া হঠাৎ প্রদ্যোতের বুকের ভিতর পর্যন্ত যেন মোচড় দিয়া উঠিল। এত অহৈতুক ভালোবাসা পাইবার সৌভাগ্য যে সহ্য করা যায় না। সমস্ত মন যে নিজের অযোগ্যতার অনুভূতিতে আড়ষ্ট হইয়া থাকে। তাহার চোখে তো জল আসিবার কথা নয়। তবু কমল ও বিমলের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া সে অশ্রু গোপন করিল। কমল অশ্রু-রুদ্ধ কণ্ঠে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল—"দাদা মরে গেছে, রাঙাদা!" বিমল ধমক দিয়া বলিল—"যাঃ, বলতে নেই ও কথা। দাদা স্বর্গে গেছে, না রাঙাদা?"

আট

সব কান্নাই এক সময়ে থামে। এ-বাড়ির কান্নাও থামিল।

অমলবাবুর সংবাদ লইতে প্রদ্যোত আসিয়াছিল, সে-সংবাদ নিদারুণ-ভাবে সে পাইয়াছে। এখন আর তাহার এ-বাড়িতে থাকার কোনো প্রয়োজন নাই। ইচ্ছা করিলে দরজা হইতে সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়াই সে চলিয়া যাইতে পারিত। বুঝি যাওয়াই তাহার পক্ষে শোভন। কিন্তু তাহা হইল না।

বিমল-কমল তাহাকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বৃদ্ধার শোকের আবেগ শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ক্লান্তিতে বেদনায় দরজার কাছেই বসিয়া ধুঁকিতেছে।

অমলবাবুর ছোট-ছোট ভাগিনেয় ভাগিনেয়ীরা অবাক হইয়া কজনের মুখের দিকে চাহিতেছে। দরজার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে অমলবাবুর দুই বোন।

প্রদ্যোতের সমস্তই অদ্ভুত লাগিতেছিল। কেমন যেন তাহার আজ মনে হইল, এই পরিবারটির সহিত সম্বন্ধ তাহার মাত্র দুদিনের নয়; ইহাদের সুখ-দুঃখ, আশা-ভরসার সহিত তাহার জীবন অনেক আগে হইতেই বিধাতা অচ্ছেদ্যভাবে জড়াইয়া দিয়াছেন। ইহাদের ভার তাহাকেই বহন করিতে হইবে। ভাগ লইতে হইবে ইহাদেরই সম্পদ ও বেদনার। এ-সম্বন্ধ অস্বীকার করিবার তাহার উপায় নাই।

বৃদ্ধা খানিক পরে একটু শান্ত হইয়া বলিলেন—"ঘরে গিয়ে বসবে চল বাবা, কতখানি পথ হেঁটে এসেছ এই দুপুরবেলায়!"

প্রদ্যোত সে-অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিল না।

জীবনের তুচ্ছতম দাবিও মৃত্যুর চেয়ে বড়, এ-কথা মানুষ বুঝি নিজের অজ্ঞাতেই বোঝে; মৃত্যুর শূন্যতা তাই বার-বার ভরিয়া ওঠে জীবনের কোলাহলে, সমাধির রিক্ততা ঢাকিয়া যায়।

অত বড় মৃত্যুর ছায়ার তলাতেই তারপর আরম্ভ হইল প্রতিদিনের জীবনের গতি। ছেলেরা উঠানে খেলা করিতেছে, রান্নাঘরে বিকালে খাবারের জন্য বুঝি উনুন ধরানো হইতেছে। চারিধারে জীবনের ছোটখাট ব্যস্ততা।

প্রদ্যোত বিমল-কমলকে লইয়া ঘরে আসিয়া বসিয়াছিল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ যেন আরও অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে, পিছনের বাঁশবনের ভিতর মাঝে-মাঝে দমকা হাওয়ার শব্দ শোনা যাইতেছে, মনে হয় বৃষ্টি শীঘ্র নামিতে পারে।

ঘরের ভিতর আলো-অন্ধকারে বসিয়া দুই ভাইয়ের কাছে প্রদ্যোত অমলবাবুর শেষ কয়দিনের সমস্ত সংবাদই লইল। জ্বর বন্ধ হইলেও শরীর যে অমলবাবুর সারে নাই তাহা সে নিজেই দেখিয়া গিয়াছিল। তারপর জোর করিয়া একদিন পুকুরে স্নান করিয়া আসিয়া তিনি আবার জ্বরে পড়েন। দেখিতে-দেখিতে সে-জ্বর সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়ায়।

চিকিৎসা যে পয়সার অভাবে একেবারে হয় নাই তাহা নয়। স্থানীয় ডাক্তার নিজে হইতেই যথেষ্ট দয়া করিয়াছিলেন, কিন্তু রোগ তখন চিকিৎসার অতীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চারদিন পূর্বে সকালবেলা হঠাৎ বুঝি হৃৎস্পন্দন বন্ধ হইয়াই অমলবাবু মারা যান। এসকল কথার মধ্যে

হঠাৎ কমল বলিল—"আমরা এখান থেকে চলে যাব জানো, রাঙাদা? মা বলেছে, আমরা এবার মামার বাড়ি যাব।"

বিমল সে-কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিল—"হ্যাঁ, মামার বাড়ি যাবে! তুই যেমন বোকা! মামার বাড়ি আমাদের আছে নাকি? এক মামা ছিল, সে তো কবে মরে গেছে।"

কমল-বিমলের এ-কথাবার্তা না শুনিলেও, এ-সংসারের অবস্থাটা বোঝা প্রদ্যোতের পক্ষে কঠিন হইত না। এই বিপদের পর ইহাদের সংসার কেমন করিয়া চলিতেছে, ভবিষ্যতেই বা কেমন করিয়া চলিবে, প্রদ্যোতের তাহাই এখন জানিতে ইচ্ছা করিতেছিল, কিন্তু ছোট এই দুটি ছেলের নিকট সে-সংবাদ পাওয়া যায় না। অমলবাবুর মা'র কাছেও গায়ে পড়িয়া কথাটা জিজ্ঞাসা করা উচিত হইবে কিনা, সে বুঝিতে পারিতেছিল না।

অনেকক্ষণ বাদে সে জিজ্ঞাসা করিল—"এ-গাঁয়ে তোমাদের আপনার লোক কেউ নেই, বিমল?"

আপনার লোক! বিমল বেশ ভাবনায় পড়িয়াছে বোঝা গেল; কমলকে কিন্তু ভাবিতে হইল না। চটপট সে জবাব দিল—"হ্যাঁ, আরও অনেক লোক আছে, রাঙাদা! তুমি চেনও না। ওই ওধারে, রতনদের বাড়ি, আর এই বাঁশ বাগানের পাশে কেষ্ট, নন্দ, হাবু—"

তাহার কথার মাঝে ধমক দিয়া বিমল বলিল—"তুই থাম! ওদের বুঝি আপনার লোক বলে? ওরা কি আমাদের কেউ হয়, না আমাদের ভালোবাসে? কেষ্টর বাবা আমাদের বাঁশ বাগান খানিকটা কেড়ে নিয়েছে, জানো রাঙাদা?"

দুই ভায়ের কথা হইতে আর কিছু না হউক, এ-সংসারের আবেষ্টনটির

আভাস কিছু-কিছু প্রদ্যোত পাইতেছিল। চারিদিকের লোভ ও স্বার্থপরতার মাঝে এই পরিবারটি নিজেদের অধিকারটুকুও যে ভালো করিয়া বজায় রাখিতে পারিতেছে না, এটুকু তাহার বুঝিতে বাকি ছিল না। তাহার বিস্মৃতির যবনিকা এখনও সমান ভাবেই সমস্ত অতীতকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। তবু কেমন যেন তাহার মনে হয়, এই শ্বাসরোধকারী স্বার্থপরতার আবহাওয়ার সহিত সে অপরিচিত নয়। জীবন যেখানে নিস্তেজ নির্জীব ভাবে মৃত্যুর সহিত দুর্বল বোঝাপড়া করিয়া বহিয়া চলিয়াছে, সেখানকার মন্থর স্রোতের ক্লেদ ও গ্লানি যেন সে ভালো করিয়াই জানে।

কিন্তু এই সংসারটির জন্য সে কীই বা করিতে পারে, ক্ষমতাই তাহার কতটুকু! কোনো রকমে ভাগ্য-ক্রমে তাহার নিজের জীবিকাটুকু সে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে, তাহা হইতে ইহাদের সামান্য সাহায্য সে করিতে পারে; কিন্তু এই পরিবারটির সমস্যা তাহাতে মিটিবে কি? সত্য কথা বলিতে গেলে, এই সংসারটিকে খাড়া করিয়া তোলা কি সম্ভব? অমলবাবুও তো এই চেষ্টাই করিয়াছিলেন এবং এই চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে প্রাণও দিতে হইয়াছে। ধীরে-ধীরে তাঁহার সমস্ত প্রাণশক্তি ইহাদেরই জন্য নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে।

ইহাদের ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া সত্যই প্রদ্যোত কোনো কূল দেখিতে পায় না। কিন্তু একটা কথা সে ভালো করিয়াই উপলব্ধি করিতে পারে। ইহাদের সহিত নিজের ভাগ্যকে বিচ্ছিন্ন করিতে আর সে পারিবে না, বিচ্ছিন্ন করিতে সে চাহে না। ইহাদের ভার যত গুরুভারই হোক, তা বহন করাতে তাহার নিজেরই একটা স্বার্থ আছে। চারিধারে শূন্যতার মাঝে এইবার সে পাইয়াছে একটা আশ্রয়, পাইয়াছে এমন

একটা অবলম্বন যাহার দ্বারা নবজাগ্রত জীবনকে কিছু পরিমাণে অন্তত সে সার্থক করিয়া তুলিতে পারে।

সমস্ত ব্যাপারটার ভিতর ভাগ্যের হাত বুঝি অনেকখানি আছে। এই পরিবারটির সহিত পরিচয়, অমলবাবুর মৃত্যু, সমস্তই যেন ঘটিয়াছে অদৃশ্য কোনো নিয়তির ইঙ্গিতে! সে ইঙ্গিত প্রদ্যোত উপেক্ষা করিতে পারিবে না। একদিন অমলবাবুকে সে ঈর্ষা করিয়াছে, আজ ভাগ্য তাহাকে যেন পরীক্ষা করিবার জন্যই সেই আসনে বসাইয়া দিয়াছে। পশ্চাৎপদ হওয়া আর তাহার সাজে না, হইতে সে চাহে না।

বাহিরে অনেকক্ষণ হইতেই টিপ-টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, হঠাৎ আকাশ যেন আর জলভার ধরিয়া রাখিতে পারিল না। মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়া আসিল। ঘর-দোর অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। পাতার চালের কত দিন সংস্কার হয় নাই কে জানে! খানিক বাদেই উপর হইতে টিপ টিপ করিয়া জল চুয়াইয়া পড়িতে আরম্ভ হইল।

কমল উৎসাহভরে বলিল—"আমাদের ঘরে আরও জল পড়ে জানো, রাঙাদা! চল না, দেখবে চল না!"

প্রদ্যোত কিন্তু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। আপনা হইতে যে-ভার সে নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইতে চাহিতেছে, তাহার গুরুত্ব সে ভালো করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিল।

খানিক বাদে বৃষ্টির ভিতর ভিজিতে-ভিজিতে অমলবাবুর মা ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন। "গাঁয়ের পথঘাটের যা অবস্থা, কাদায় কাদা হয়ে গেছে এর মধ্যেই। যাবার যে বড্ড কষ্ট হবে।"

প্রদ্যোত বলিল—"আজ আর যাব না মা, বৃষ্টি না হলেও যেতাম না।"

রাত্রেও বৃষ্টি থামিল না।

অমলবাবুর ঘরেই প্রদ্যোতের শুইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। খাওয়া-দাওয়া সারিয়া সেখানেই সে আসিয়া বসিয়াছিল।

দাদার ঘরের দিকে কমল ও বিমল ইহার পূর্বে নিশ্চয়ই মাড়াইত না। আজ কিন্তু তাহাদের ঘর ছাড়িবার কোনো লক্ষণ নাই। দুজনেই যে রাঙাদাদার সহিত শয়ন করিবে, এ-ব্যবস্থা তাহারা নিজেরাই করিয়া লইয়াছে।

প্রদ্যোত রাত হইতেছে দেখিয়া তাহাদের ঘুমাইতে যাইতে বলিল, কিন্তু সে-কথা কে শোনে!

কমল একটা অজুহাতও খুঁজিয়া বাহির করিল। বার কয়েক পীড়াপীড়ি করিতে সে বলিল—"ও-ঘরে কেমন করে শোব! বড্ড জল পড়ছে যে!" কমল ও-ঘরে শুইতে গেলে বিমলের অধিকার কায়েমী হয়, সে তাই প্রলোভন দেখাইয়া বলিল—"যা না বড়দি গল্প বলবে'খন।" গল্প সম্বন্ধে কমলের কিন্তু কোনো প্রকার আসক্তি আর নাই, দেখা গেল। অনায়াসে দাদাকে সে-সৌভাগ্য উপভোগ করিতে অনুমতি দিয়া সে বলিল—"তুমি যাও না। তুমিই তো গল্প ভালোবাসো!"

রাঙাদার কাছে নিজের মর্যাদা বাঁচাইয়া বিমল বলিল, "আহা ওসব ছেলেমানুষী গল্প বুঝি আমি ভালোবাসি! আমি বই-এ ওর চেয়ে কত ভালো গল্প পড়ি।"

বাকযুদ্ধে কে শেষ পর্যন্ত পরাস্ত হইত বলা যায় না, কিন্তু সেই সময়ে মা আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। মায়ের কথার উপর বুঝি কথা চলে না, নিতান্ত অনিচ্ছুক ভাবে কমল-বিমলকে রাঙাদার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অন্য ঘরে শুইতে যাইতে হইল। বিমল যাইবার সময়ে কানে-কানে বলিয়া গেল যে কাল ভোর হইলেই সে আসিবে এবং রাঙাদাকে লইয়া, এমন এক

জায়গায় বেড়াইতে লইয়া যাইবে যে কমল হাজার চেষ্টা করিলেও তাহাদের ধরিতে পারিবে না।

দাদার এ-দুরভিসন্ধি কিন্তু কমল ধরিয়া ফেলিয়াছে, দেখা গেল। অর্ধেক পথ হইতেই একবার ফিরিয়া আসিয়া সে চুপি-চুপি প্রদ্যোতের কানের কাছে বলিয়া গেল—"দাদা কাল লুকিয়ে বেড়াতে যাবে বললে, না রাঙাদা? দাদার চেয়ে আমি অনেক ভোরে উঠব, দেখো।"

অমলবাবুর মা ঘরের ভিতর আসিয়া বসিয়াছিলেন। এইবার অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—"এ-ঘরে ঢুকতে যে আর ইচ্ছে করে না বাবা; কিন্তু তোমায় শুতে দেব, এমন একটা ঘরও নেই।"

কথা বলিবার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহার কান্না উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সান্ত্বনা দিবার নিষ্ফল চেষ্টা না করিয়া প্রদ্যোত চুপ করিয়া রহিল। খানিক বাদে বৃদ্ধা একটু শান্ত হইলে সঙ্কুচিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনাদের এখন চলবে কি করে?"

সামান্য একটা প্রশ্ন। কিন্তু ইহার জন্যই সমস্ত সন্ধ্যা ধরিয়া যেন প্রদ্যোতের নিজেকে প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। সাধু সঙ্কল্প অত্যন্ত সহজেই করা গিয়াছিল; কিন্তু কাজের বেলায় এত বাধা আসিবে, তাহা প্রদ্যোত ভাবে নাই। এই পরিবারটির সহিত নিজের ভাগ্যকে জড়াইয়া লইতে সে চায় বটে; কিন্তু ইঁহারা তাহার সে-চেষ্টাকে যে কি ভাবে গ্রহণ করিবেন, তাহাও ভাবিয়া দেখা দরকার। সত্য-সত্যই কোনো আত্মীয়তার সূত্রই তাহাদের মধ্যে নাই। সামান্য একটু সহানুভূতি হইতে ঘনিষ্ঠতার স্তরে একেবারে নামিয়া আসা সহজ নয়, বুঝি শোভনও নয়। এতক্ষণ পর্যন্ত তাই প্রদ্যোত দ্বিধায়, দ্বন্দ্বে কাটাইয়াছে। গায়ে পড়িয়া উপকার করিতে যাওয়ার ভিতরও কেমন একটা নির্লজ্জতার আভাস

পাইয়া তাহার মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছে। কেবলই মনে হইয়াছে, ইঁহাদের অভাবের খোঁজ লইতে গিয়া কোনো রকম অপমান সে না করিয়া বসে। হাজার হইলেও সে বাহিরের লোক—অমলবাবুর পরিচিত বন্ধু মাত্র। এ-সংসারের সহিত পরিচয়ও তাহার গভীর হয় নাই। কমল-বিমলের শিশুমন অনায়াসে তাহাকে আপনার করিয়া লইয়াছে বটে, কিন্তু বড়দের মনোভাব তেমন না হইতেও পারে, না হওয়া অস্বাভাবিকও নয়। তাহার নিঃসঙ্গতার মরু হইতে যে-আগ্রহ লইয়া সে এই দরিদ্র সংসারটিকে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহিয়াছে, ইহাদের কাছে তাহা বাড়াবাড়ি বলিয়াও মনে হইতে পারে। হয়তো সত্যই সে অধিকারের সীমা ছাড়াইয়া যাইতেছে।

প্রশ্ন করিয়া তাই প্রদ্যোত অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া রহিল। কিন্তু প্রদ্যোতের আশঙ্কা বোধ হয় অমূলক। বৃদ্ধা সহজভাবেই এ-প্রশ্ন গ্রহণ করিয়াছেন, মনে হইল। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি হতাশভাবে বলিলেন—"কি বলব বাবা, চলবার তো কোনো উপায়ই দেখছিনে।"

সাহস পাইয়া প্রদ্যোত বলিল—"বিমল-কমলের পড়াশুনারও তো একটা ব্যবস্থা দরকার, বেশি বয়স হয়ে গেলে আর মন বসবে না।"

অমলবাবুর মা বলিলেন—"তার চেয়ে আরেক ভাবনা যে আমার বড়, বাবা! বিমল-কমল বেটা ছেলে, বেঁচে থাকলে মোট বয়েও খেতে পারবে, কিন্তু নির্মলার বিয়ের বয়স পার হয়ে যাচ্ছে, এখন বিয়ে না দিলে আর যে মুখ দেখাতে পারব না। এরি মধ্যেই লোকে কত নিন্দে করছে।"

প্রদ্যোত এদিকের কথাটা সত্যই ভাবে নাই। খানিক নিস্তব্ধ থাকিয়া সে বলিল—"এখন আপনাদের আয় কী আছে?"

"আয় ?" বৃদ্ধা হতাশভাবে বলিলেন—"নেবুর মাইনেটুকুই সম্বল ছিল এতদিন। এখন এই ভদ্রাসনটুকু শুধু আছে, এই বেচে-টেচে তোমরা যদি মেয়েটাকে পার করে দিতে পার।"

"মেয়ে না হয় পার হল; কিন্তু ভদ্রাসন গেলে থাকবেন কোথায়, ছেলেপুলেরা খাবে কী ?"

বৃদ্ধা চিরন্তন রীতি অনুযায়ী ভাগ্যের দোহাই পাড়িয়া বলিলেন—"ভগবান যা মাপাবেন। কিছু না থাক, গাছতলা তো আছে; ভিক্ষে তো এখনো মেলে।"

প্রদ্যোত চুপ করিয়া ছিল, বৃদ্ধা আবার বলিলেন—"বিক্রী না করলেও, জায়গা-জমি যেটুকু আছে রাখতে তো পারবো না বাবা। নেবু বেঁচে থাকতেই একটু করে চারধার থেকে সবাই ফাঁকি দিচ্ছিল। খিড়কির পুকুরটা জোর করে মুখুজ্যেরা ভরাট করলে, বখরার দাম দিলে না। দলিলপত্র তো নেই, কে ওদের সঙ্গে ঝগড়া করে! বোসেরা বাঁশ-বাগানের অর্ধেকটা দখল করে নিয়েছে এরই মধ্যে। এখন তো ওদের আরো সুবিধে হল। দুটো নাবালক ছেলে আর মুরুব্বির মধ্যে আমি অথর্ব বুড়ো একটা মেয়েমানুষ; এখন তো যা খুশি তাই করবে। তার চেয়ে ও বেচে দেওয়াই ভালো। নেবুর অসুখের সময় থেকেই পালেরা ক'ভাই মিলে কিনতে চাইছে। দর যাই হোক, টাকা কটা তো পাওয়া যাবে।" প্রদ্যোত এতক্ষণে বুঝি অনেকটা জোর পাইয়াছে। দৃঢ়ভাবে সে বলিল—"লোকে ফাঁকি দিয়ে নেবে বলে জলের দামে বিক্রি করতে হবে ? তা হতে পারে না মা।" বৃদ্ধা হতাশভাবে বলিলেন—"আমাদের হয়ে দাঁড়াবার যে কেউ নেই বাবা!"

প্রদ্যোত চুপ করিয়া রহিল।

নয়

প্রদ্যোত এখনও পর্যন্ত সেই বোর্ডিং-এই আছে; বিদেশে পড়াইতে যাওয়ার কাজটি শেষ পর্যন্ত তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতেই হইল। সকাল বিকাল সে টিউশনি করে। অমলবাবুর মতো রাত্রে একটা পাইলেও তাহার আপত্তি নাই, কিন্তু অমলবাবুর মতো সে ইহাতে ক্ষুব্ধ নয়। বিক্ষোভ তাহার মনের দিগন্তে কোথাও নাই, সমস্ত আকাশ উৎসাহের আলোয় ঝলমল করিতেছে।

প্রদ্যোতের নূতন জীবন আরম্ভ হইয়াছে—অন্ধকার যবনিকার উপর দেখা দিয়াছে রুপালী তন্তুজাল। আশা হয়, অচিরে সমস্ত শূন্যতা সূক্ষ্ম সেই তন্তুর বুনানিতে ঢাকিয়া যাইবে। স্মৃতির সঞ্চয় তাহার মনে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে ইহার মধ্যেই। জীবন তাহার একটা কেন্দ্র পাইয়াছে প্রদক্ষিণ করিবার মতো। তাহারও নিজস্ব একটা জগৎ এখন আছে, সে-জগতে তাহার নিশ্চিন্ত অধিকার। ইহারই জন্য ভাগ্যের কাছে সে কৃতজ্ঞ।

কি ছোটখাট ব্যাপারকে আশ্রয় করিয়াই তাহার মনে উৎসাহ ও আনন্দের এমন ঢেউ উঠিতেছে, ভাবিলে অবশ্য অবাক হইতে হয়। অসাধারণ কিছুই তাহার মধ্যে নাই। অমলবাবুর মতোই সে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া ছেলে পড়ায়। মিতব্যয়িতার চরম আদর্শ হইয়া পয়সা বাঁচায় ও সপ্তাহের ছয়টি দিন একটি দিনের আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে। কিন্তু এই সমস্ত তুচ্ছ ব্যাপারেই যেন পরম রহস্যের স্বাদ আছে,

উত্তেজনা আছে দুরূহতম সাধনার। প্রদ্যোতের সমস্ত মন ইহাতেই তন্ময় হইয়া থাকে, আপ্লুত হইয়া যায় অদ্ভুত আনন্দ-রসে। সে যেন নূতন কিছু সৃষ্টি করিতেছে, নূতন এক জগৎ, মানবেতিহাসের নূতন এক অধ্যায়। সাঙ্ঘাতিক রোগভোগের পর সারিয়া উঠিলে সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত অনুভূতি প্রখরতর হইয়া ওঠে, মন অতিরিক্ত তীক্ষ্ণভাবে সমস্ত জীবনের স্বাদ যেন পায়। প্রদ্যোত রোগ নয়, একেবারে মৃত্যুর শূন্য তমিস্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়াছে জীবনের অসীম তৃষ্ণা লইয়া। প্রখরতম অনুভূতি, সূক্ষ্মতম জীবন-বিলাসিতার ক্ষুধা লইয়া সে জাগিয়াছে। তাহার কাছে কিছু তুচ্ছ নয়। অভ্যাসের ক্লান্তিতে জীবনের স্বাদ যাহাদের কাছে বিরস হইয়া আসিয়াছে, প্রদ্যোতের সুতীক্ষ্ণ উপভোগের মর্ম বোঝা তাহাদের সাধ্য বুঝি নয়।

ইতিমধ্যে বার কয়েক প্রদ্যোত দারবাক যাতায়াত করিয়াছে। পরিবারটির সহিত সম্বন্ধ তাহার সহজ হইয়া আসিতে বিলম্ব হয় নাই। সম্বন্ধ সহজ করিবার পথে সব চেয়ে সাহায্য করিয়াছে অবশ্য অমলবাবুর দুটি ভাই। তাহাদের ভালোবাসা অন্তরঙ্গতার পথ মসৃণ করিয়া দিয়াছে।

শনিবার সকাল হইতেই প্রদ্যোতের আজকাল বুকটা কেমন করিতে থাকে আনন্দে, উত্তেজনায়। বোর্ডিং-এর অধিকাংশ বাসিন্দাই চাকুরে, শনিবারটির দিকে তাহারাও উৎসুকভাবে সারা সপ্তাহ চাহিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের কাহারও অনুভূতির ততখানি তীব্রতা বুঝি নাই।

সুপারি নারিকেলের বন, তাহারই ছায়ায় পাতায়-ছাওয়া একটি বাড়ি —শুকনো মাটির আঙ্গিনা তাহার খটখট করিতেছে। একধারে ফুটিয়াছে ডালিম গাছের ফুল। সমস্ত জড়াইয়া একটি শীতল মধুর গন্ধ উঠিতেছে ছায়াস্নিগ্ধ বাতাসে। ক্ষণে-ক্ষণে এ-সমস্ত প্রদ্যোতের মনে

পড়িয়া যায়। নূতন প্রেমের কল্পনার মতো এই ছবিটি অদ্ভুতভাবে তাহাকে নাড়া দেয়, অপ্রত্যাশিতভাবে ঢেউ তুলিয়া যায় তাহার সারা মনে। তাহারও আছে নিভৃত এক আশ্রয়, ছুটি লইয়া বিশ্রাম করিবার, স্নেহ ও সহানুভূতির উত্তাপে আরাম করিয়া দিনযাপন করিবার একটি নীড়, একথা ভাবিতেই তাহার মনে আনন্দ-শিহরণ জাগে।

বড়দির ছেলেমেয়ের জন্য নূতন কী খেলনা কিনিবে, নূতন কী জিনিস কমল-বিমলের জন্য আনিবে, তাহাই ভাবিতে-ভাবিতে সে পড়াইতে যায়। পড়ানোটা তেমন ভালো করিয়া জমে না বোধ হয়। বিকালের জন্য তাহার মনটা উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে।

বাজার সে দুপুর বেলাই শেষ করিয়া রাখে; কোথায় অসময়ের একটু আনাজ, পাড়াগাঁয়ে যাহা একেবারে দুষ্প্রাপ্য, কোথায় সস্তা একটি খেলনা—মূল্যের তুলনায় চাকচিক্য যাহার অত্যন্ত বিস্ময়কর, দিদির কাঁথা সেলাইএর জন্য গুলিসুতা, কমলের লাট্টু ঘুরাইবার জন্য একটা লেত্তি, বিমলের লিখিবার জন্য একটা রুল-টানা খাতা, রান্নাঘরের জন্য একটা সস্তা কাঠের চাকি অনেক কিছুই তাহাকে সংগ্রহ করিতে হয়।

তাহার আয়োজন বিকালের আগেই সম্পূর্ণ হয়। তারপর স্টেশনে গিয়া ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করিতেও যেন তাহার তর্ সহে না। সময় যে কত মূল্যবান, তাহা প্রদ্যোত একাই যেন বুঝিয়াছে।

ট্রেন কিন্তু যথাসময়েই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ায়। ছোটখাট মোটটি লইয়া প্রদ্যোত তৃতীয় শ্রেণীর একটি কামরায় জানালার ধারে গিয়া বসে। তাহার পর তাহার মনে উল্লাসের প্রতিধ্বনি তুলিয়া ট্রেন ছাড়ে। প্ল্যাটফর্ম, ওভার-ব্রিজ, শহরের জীর্ণতম একটি অংশ দেখিতে-দেখিতে পিছনে ফেলিয়া ট্রেন বিস্তীর্ণ উদার মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়ে।

বর্ষা শেষ হইয়া আসিতেছে। দিগন্ত হইতে দিগন্ত পর্যন্ত দুলিতেছে হরিৎ সমুদ্র, চাষাদের গ্রাম তাহারই মাঝে-মাঝে দ্বীপের মতো ভাসিতেছে এবং সমস্ত দৃশ্যের উপর পড়িয়াছে হয়তো অস্ত-রবির লোহিতাভ রশ্মি বিষণ্ন মধুর হাসির মতো। পরম পরিতৃপ্তিতে প্রদ্যোত জানালার ধারে মাথা রাখিয়া চোখ দুটি মুদিত করে। জীবনের স্বাদ এত মধুর, এমন অপরূপ! দূর হইতে বিচ্ছিন্নভাবে, নির্লিপ্তভাবে যে গ্রামকে সেদিন সে বিচার করিয়াছিল তাহারই রূপ আজ তাহার কাছে একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে।

ছোট একটি স্টেশনে আসিয়া ট্রেন থামে। তাহার আগের সমস্ত পথটি যেন প্রদ্যোতের মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। মুখস্থ হইলেও, সে পথটি পুরাতন কবিতার মতো মধুর। প্রতিবার ট্রেন সেটিকে আবৃত্তি করিয়া যেন নূতন অর্থ, নূতন ইঙ্গিত তাহার কাছে উদ্‌ঘাটিত করিয়া যায়। কোথায় ছোট একটা সাঁকো; ট্রেনের আওয়াজ ভারি হইতে না হইতে মিলাইয়া যায়; শীর্ণ একটু জলপথ গিয়াছে এধারের প্রান্তরের সহিত ওধারের মিতালি করিতে; ছোট একটি মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া কোথায় ছোট একটি চাষাদের গ্রাম সরল দিকচক্রবাল-রেখাকে ভাঙিয়া বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছে; তাহার পর বুঝি বিস্তীর্ণ এক জলা, আসন্ন-সন্ধ্যার ম্লান আলোয় পড়িয়া আছে সৃষ্টি-ক্লান্ত বিধাতার অবসাদের মতো—প্রাণের স্পন্দন নাই, নাই বর্ণ ও রেখার ব্যঞ্জনা। অসীম ধূসর শূন্যতা, মনে হয় ইহার শেষ নাই। কিন্তু ট্রেন তাহাও পার হইয়া যায়, আবার দেখা যায় শস্য-আন্দোলিত প্রান্তর, মাঝে-মাঝে আঁকা-বাঁকা জলপথ, ডোঙা বাহিয়া চাষী চলিয়াছে দূর গ্রামের দিকে। তারপর শীর্ণকায়া একটি নদী, কোন সুদূর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে অশ্রু-

ধারার মিনতির মতো। ট্রেনের স্বর গাঢ় হইয়া আসে আবেগে, কাঁপিয়া ওঠে বুঝি একটু, গতি মন্থর হইয়া আসে। খানিক পরেই আসিয়া পড়ে লেভেল ক্রসিং। লোহার গেট ধরিয়া নীল জামা গায়ে লাল পাগড়িবাঁধা পয়েন্টস্-ম্যান দাঁড়াইয়া আছে। প্রদ্যোত তাহাকে চেনে, জানে তাহার গুমটি-ঘরটি। যে-ছেলেটি গেটের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া হাত নাড়িয়া ট্রেনকে উৎসাহ দেয়, গেটের ওপারে ছইঢাকা গরুর গাড়ি লইয়া যে-গাড়োয়ান অপেক্ষা করে, মাথায় পিঠে মোট লইয়া যে-সমস্ত চাষী পুরুষ ও নারী ট্রেনের দিকে চাহিয়া থাকে, তাহারাও যেন তাহার পরিচিত। তারপর কোথায় কোন শাখা লাইন ছুটিয়া বাহির হয় ট্রেনের পথ হইতে সচকিত অজগরের মতো, কোথা হইতে দেখা যায় ডিস্ট্যান্ট সিগন্যালের বরাভয় নীল-আলো, কোথায় গ্রামের ছাড়া-ছাড়া কয়েকটি ঘর-বাড়ি লাইনের ধারে ট্রেনকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আগাইয়া দাঁড়াইয়া আছে—সমস্তই তাহার জানা।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। আকাশ ও পৃথিবী এবার অন্ধকারে যেন মিলিত হইয়া, একাকার হইয়া যাইবে। তাহারই ভিতর ছোট স্টেশনের অনুজ্জ্বল আলোগুলি অন্তরঙ্গ স্নেহ-সম্ভাষণের মতো মনে হয় অনুগ্রমধুর। প্রদ্যোত ট্রেন হইতে নামে। ট্রেন ধীরে-ধীরে স্টেশন ছাড়িয়া যাইতেই প্ল্যাটফর্ম হইতে নামিয়া লাইনগুলি পার হয়। ওধারেও কাঁকর বিছানো দীর্ঘ প্ল্যাটফর্ম। মেহেদিগাছের বেড়ায় রেলিঙ এখন অস্পষ্ট দেখায়, করোগেটে ছাওয়া স্টেশনের একটি শেড, সেইটিই ওয়েটিংরুম, সেইটিই টিকিট কিনিবার স্থান। স্টেশনের নাম-লেখা একটি বাতি—টিকিট ঘরের দেওয়াল হইতে সামান্য একটু আলো শেডের অন্ধকারে মিলাইয়া গিয়াছে। সেই শেড পার হইয়া সিঁড়ি বাহিয়া প্রদ্যোত পথে নামে।

খানিকটা শূন্য প্রান্তর পার হইয়া স্টেশন হইতে পথটি সোজা গিয়া নিকটের গ্রামের ঘন-বিন্যস্ত-গাছপালার পুঞ্জীভূত অন্ধকারে হারাইয়া গিয়াছে। পথে চলিতে-চলিতে প্রদ্যোত একবার বুঝি পিছন ফিরিয়া চায়। শূন্য প্রান্তরের মধ্যে এই পরিচ্ছন্ন স্টেশনটিরও একটি আকর্ষণ তাহার কাছে আছে। তাহার জীবনের সঙ্গে এই স্টেশনটির ছবিটিও আজকাল মিশিয়া গেছে।

বড় রাস্তা হইতে, মাঠের উপরকার আলের পথ, সেখান হইতে ঝাউ-তলায় নালার উপরকার খেজুর-গুঁড়ির সাঁকো পার হইয়া, গ্রামের ভিতরকার সংকীর্ণ অন্ধকার আঁকাবাঁকা গলি, চাষীদের মরাই-এর ধার দিয়া, সজিনাফুল ছড়ানো মেটে বাড়ির কানাচ দিয়া, পানা পুকুরের কোল ঘেঁষিয়া তারপর অন্ধকারে দীর্ঘ পথ, সবই প্রদ্যোত উপভোগ করিতে-করিতে পার হইয়া যায়। এ-গ্রামের প্রতি কোনো বিতৃষ্ণা আর তাহার নাই। ইহার পরিত্যক্ত আরণ্যরূপই এখন যেন তাহার কাছে মূল্যবান। তাহার মনের আনন্দরসে এ-গ্রামের উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির রূপও মধুর হইয়া উঠিয়াছে।

তারপর প্রথম বাড়ি গিয়া অন্ধকার সদর দরজায় ছোট একটি টোকা দেওয়া—তাহার উত্তেজনার বুঝি তুলনা নাই। যত ধীরেই সে আঘাত করুক, ভিতরে প্রতীক্ষা-ব্যাকুল কান সজাগ হইয়া আছে তাহার জন্য। কমল-বিমলের উচ্ছ্বসিত কলকণ্ঠ। তাহার হাত হইতে পুঁটুলি কাড়িয়া লইবার জন্য ঝগড়া। বড়দিদির একটু ভর্ৎসনা।

তারপর গ্রামের ঝিল্লিমর্মরিত শীতল অন্ধকারে দাওয়ার উপর মাদুর বিছাইয়া ম্লান প্রদীপের আলোয় পুঁটুলি খুলিবার অনুষ্ঠান। চারিধারে সকলে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। কমল একেবারে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়াছে

তাহার উপর। ধীরে-ধীরে রূপকথার পুরীর মায়া-পেটিকা বুঝি খোলা হয়। "ওমা, এর মধ্যেই কপি কোথায় পেলে ?" বড়দিদির কণ্ঠে আনন্দ ও বিস্ময়ের সুর। হঠাৎ প্রদ্যোতের পকেট হাতড়াইয়া একটা জিনিস পাইয়া কমল আনন্দে চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠে। বিমল সঙ্গে সঙ্গে ওঠে তাহার আবিষ্কারের সন্ধান লইতে। কিন্তু কমল আনন্দ-সংবাদ তো লুকাইয়া রাখিবে না। সমস্ত পৃথিবীতে সে যে ইহা রাষ্ট্র করিতে চায়। "আমার লাট্টু লেত্তি, লাট্টু লেত্তি—ছোড়দার চেয়ে ভালো !" গ্রামান্তরের লোকের সে-আনন্দধ্বনি শুনিতে পাওয়া উচিত।

এইবার মুখভারের ভান করিয়া প্রদ্যোত পুঁটুলিটা একটু মুড়িয়া রাখে। হতাশভাবে বলে—"নির্মলার উল্ পাওয়া গেল না বড়দি। শহরের মেয়েরা আজকাল উল্ বোনা ছেড়ে দিয়েছে। দোকানে তাই রাখে না।" বড়দিদি এ-দুষ্টামিতে সাহায্য করেন। হাসিয়া বলেন—"তাই তো ভারি মুশকিল হল যে !" নির্মলা ঠোঁট বাঁকাইয়া বলে—"আমি কি উল্ আনতে বলেছিলাম নাকি !" ঔদাসীন্যভরে সে সেখান হইতে চলিয়া যাইবার উপক্রম করে। মা মাঝে পড়িয়া বলেন—"আহা, কেন ওকে রাগানো বাপু ! ওই তো রয়েছে উল্ !"

তাহার পর উল্ বাহির হয়, বাহির হয় কয়েকটি খেলনা। অন্ধকার মুখর হইয়া ওঠে আনন্দ কোলাহলে। লাটাই-এর বদলে রুল-টানা কপিবুক পাইয়া শুধু বুঝি বিমলই একটু অপ্রসন্ন বোধ করে। কিন্তু সে-ভাব তাহার ক্ষণিক। কপিবুকের লিপি কুশলতাকে পরাস্ত করিবার উৎসাহে মাদুর হইতে কমলকে বিতাড়িত করিয়া সে সমারোহ করিয়া খাতাপত্র দোয়াত পাতিয়া বসে।

সুমিষ্ট একটি সংসারযাত্রা। কে বলিবে, মৃত্যুর ছায়া এখনো এ সংসারের

উপর হইতে অপসৃত হয় নাই! কে বলিবে, লোভ ও স্বার্থপরতা নিঃশব্দে ওৎ পাতিয়া আছে এই দুর্বল সংসারের চারিধারে! বলিবার প্রয়োজন কী? সকল কথা সব সময় স্মরণ করিতেও নাই।

মনের উপর যবনিকা ফেলারও বুঝি প্রয়োজন আছে। যবনিকা শুধু আড়ালই করে না, উজ্জ্বলও যে করিয়া তোলে নিজের পটভূমিতে, সে-কথা তো প্রদ্যোত জানে না। জীবন-বিধাতার এইটুকু অনুগ্রহের জন্যই সে কৃতজ্ঞ। রহস্যসাগরে ঘেরা আয়ুর এই দ্বীপের যথার্থ মূল্য, সত্যকার সার্থকতা সে বুঝিয়াছে। স্বপ্ন ও সত্যে মিলাইয়া নশ্বর এক সৌধ নির্মাণ করিবার অধিকার, জীবনের অপরূপ মুহূর্তগুলিকে উপভোগ করিবার সৌভাগ্য, ইহারই কি তুলনা আছে।

এইবার নিশ্চিন্ত বিশ্রামের পালা। মেয়েরা রান্নাঘরে গিয়াছে। ছেলেরা যে যার খেলা কাজ লইয়া মত্ত। মাদুরের একধারে বসিয়া, হেলান দিয়া শুইয়া প্রদ্যোত সামনের স্নিগ্ধ শীতল অন্ধকারের দিকে চাহিয়া থাকে। অপরূপ শান্তি আর স্তব্ধতা তারকাখচিত আকাশে, অনির্বচনীয় প্রশান্তি তাহার মনে। মাধুর্য-রসে তাহার মন ভরিয়া গেছে। নিস্তব্ধ গ্রামের সুমধুর আলস্য সঞ্চারিত হইয়া গেছে তাহার দেহে।

ঘনকৃষ্ণ বিস্মৃতির যবনিকা কি ঢাকিয়া গেছে রুপালী সুতার জালে? অকূল সমুদ্রের নিঃসঙ্গ বন্ধ্যাদ্বীপ কি শ্যামল হইয়া উঠিল জীবনের স্পর্শে, মুখর হইয়া উঠিল জীবনের কোলাহলে?

তাহাই তো মনে হয়।

দশ

দারবাকের একটি জীর্ণ ভগ্ন মেটে বাড়ির চেহারা এমন বদলাইয়া গিয়াছে যে দেখিলে সহজে বিশ্বাস হয় না।

প্রদ্যোতের ছুটি নাই বলিলেই হয়। সপ্তাহে একদিনের বেশি সে বড় গ্রামে আসিতে পারে না। কিন্তু এই সামান্য সময়েই সে জীর্ণ বাড়িটির অনেক সংস্কার করিয়া ফেলিয়াছে।

তাহার উৎসাহের অন্ত নাই। বিমল-কমলও বুঝি তাহার সহিত পাল্লা দিতে পারে না। এই বাড়ি আর পরিবারটুকুই তাহার সৃষ্টির ক্ষেত্র। ইহাকেই সে নূতন করিয়া রচনা করিতে চায়।

শনিবার রাতটা বিশ্রামে কাটিয়া যায়। রবিবার ভোর না হইতেই আরম্ভ হয় প্রদ্যোতের আয়োজন। আজ বাড়ির চারিধারে ভাঙা দেওয়াল মেরামত করিতে হইবে। রাজমিস্ত্রির প্রয়োজন নাই। সে নিজেই পারিবে, আর বিমল-কমল যোগাড় দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আছে। পুকুর ধার হইতে কাদা মাটি বিমল-কমল সংগ্রহ করিয়া আনে। প্রদ্যোত আগের দিন কলিকাতা হইতে কর্নিক এবং গজ বুঝি নিজেই কিনিয়া আনিয়াছে। গাঙ্গুলিদের পুরানো পাঁজার কিছু ইট নামমাত্র মূল্যে খরিদ করার ব্যবস্থাও সে করিয়াছে। জানুক না জানুক কিছু আসে যায় না, কাদার সাহায্যে বাঁকাচোরা এক প্রকার গাঁথুনি প্রদ্যোত খাড়া করিয়া তোলে!

কমল-বিমল লাট্টুর আলে একটা সুতা বাঁধিয়া ঝুলাইয়া আনিয়া বলে—"এইটে ঝুলিয়ে দেখ রাঙাদা, দেওয়াল সোজা হচ্ছে কিনা ?" প্রদ্যোত হাসিয়া বলে—"ও আবার কি ?"

কমল-বিমল বিজ্ঞের মতো বলে—"বাঃ, জানোনা বুঝি ! রাজমিস্ত্রিরা তো এই দিয়ে দেওয়াল সোজা করে ! দেখ না একবার ঝুলিয়ে !"

দেওয়ালের আকার সম্বন্ধে প্রদ্যোতের নিজের কোনো প্রকার ভ্রান্ত ধারণা নাই। সে তাড়াতাড়ি বলে—"দূর আমরা কি দেওয়াল সোজা করছি নাকি ?"

কমল-বিমল একটু অবাক হইয়া যায়। জিজ্ঞাসা করে—"সোজা করবে না ?"

প্রদ্যোত গম্ভীরভাবে অম্লান বদনে বলে—"বাইরের দেওয়াল যে এবড়ো-খেবড়োই করতে হয়। চোর এলে আর তাহলে উঠতে পারবে না ! গা হাত ছড়ে যাবে।"

এ-যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিমল বলে—"ও !"

নির্মলাও দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া প্রাচীর সংস্কার দেখিতেছিল, সে হাসিয়া ওঠে। কমল-বিমল অপ্রসন্নভাবে বলে—"হাসছ যে বড় ?"

"হাসব না ! তুই যেমন বোকা !"

"কেন, বোকা কেন ?"

"বোকা নয় ! তোকে বাজে কথা যা তা বলে দিলে, আর তুই তাই বিশ্বাস করলি তো !"

কমল-বিমল সন্দিগ্ধ হইয়া এবার রাঙাদা ও ছোড়দির মুখের দিকে তাকায়। প্রদ্যোত অবিচলিত ভাবে বলে—"তুমি ওসব কথা শুনছ কেন ! বেটাছেলে কখনো বোকা হয় ?"

কমলের বিশ্বাসও সেইরূপ। তাহার মুখে আবার হাসি দেখা দেয়। নির্মলা চলিয়া যাইতে-যাইতে রাগের স্বরে বলে—"আহা তা কি আর হয়! দেয়াল গাঁথাতেই সব চালাকি বোঝা গেছে।"

কর্নিক দিয়া ইট বসাইতে-বসাইতে প্রদ্যোত উত্তর দেয়—"কে বোকা আর কে নয়, চোর এলেই বোঝা যাবে! কি বল কমল?"

কমল সায় দিয়া বলে—"হুঁ," তাহার পর কৌতূহলভরে জিজ্ঞাসা করে—"চোর আসবে তো রাঙাদা?"

প্রদ্যোত গম্ভীর ভাবে উত্তর দেয়—"আসবে না আবার! এমন দেওয়ালের লোভ সামলাবে কদিন!"

কমল ইহাতেই নিশ্চিন্ত হইয়া যাইতেছিল কিন্তু হঠাৎ সকলের উচ্চহাস্যে সে একটু বিহ্বল হইয়া পড়ে এবং হঠাৎ ভিতরে কোথায় তাহাকে পরিহাস করিবার ষড়যন্ত্র আছে সন্দেহ করিয়া অত্যন্ত রাগিয়া উঠান ছাড়িয়া চলিয়া যায়।

শুধু দেওয়াল মেরামতই নয়, প্রদ্যোত ইতিমধ্যে আরো অনেক কিছু করিয়াছে।

উঠানে ডালিম গাছটির আশে-পাশে অনেক গাছের চারা আজকাল বাড়িতেছে। বাড়ির বাহিরে অনেকখানি জায়গা এতদিন জঙ্গল হইয়া ছিল। প্রদ্যোত একদিন উৎসাহভরে তাহা সাফ করিতে লাগিয়া গেল। কমল-বিমলের জঙ্গল সাফ করিতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই, কিন্তু রাঙাদা সমস্ত ব্যাপারটাকে গভীর রহস্যে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়া অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছে। এখানে কি যে হইবে বুঝিতে না পারিয়া তাহাদের অস্বস্তির আর সীমা নাই।

বিমল কমলকে চুপি-চুপি ডাকিয়া বলে—"এখানে কি হবে জানিস?"

কমল গভীর কৌতূহলে বড়-বড় দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া জিজ্ঞাসা করে—"কী ?"

বিমল এতক্ষণ কল্পনাকে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত করিয়া মনোমত একটি জিনিস খুঁজিয়া পাইয়াছে। সে চুপি-চুপি বলে—"মন্দির হবে! গোঁসাইদের যেমন মন্দির আছে সেই রকম।"

কমলের বিস্ময়ের ও আনন্দের সীমা থাকে না। দাদার কথায় অবিশ্বাস করিবার কিছু নাই তবু সে শুধু সামান্য একটু সন্দেহ প্রকাশ করে।

"অত বড় মন্দির হবে ?"

মন্দির যখন হইবেই তখন আগে হইতে অকারণে তাহাকে ছোট করিয়া লাভ কি! বিমল গম্ভীর ভাবে বলে—"ওর চেয়েও বড়! আর অনেক-গুলো চুড়ো থাকবে।"

কমল এবার দাদার মন্দিরের একটু উন্নতি সাধন করিবার চেষ্টায় বলে—"সব সোনার চুড়ো!"

নিজের মাথা হইতে বাহির হইলে এ-সম্বন্ধে বিমল কি বলিত বলা যায় না কিন্তু কমলের প্রস্তাবে সায় সে দেয় না। ধমক দিয়া বলে—"সোনার চুড়ো! সোনার চুড়ো হবে কি করে শুনি! অত সোনা আমাদের আছে নাকি ?"

কমল একটু দমিয়া গেলেও একেবারে নিরুৎসাহ হয় না। সোনার চূড়া থাক বা না থাক একটা মন্দির তো তাহাদের হইবে। এ সময়ে সামান্য চূড়ার উপকরণ লইয়া দাদার সহিত ঝগড়া করিয়া লাভ নাই। দাদার ধমকানি তাই গায়ে না মাখিয়া সে বলে—"আমাদের মন্দিরে কাউকে কিন্তু ঢুকতে দেব না দাদা!"

বিমলের ইহাতে সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। ভ্রূকুটি করিয়া সে বলে—"ইস্ অমনি ঢুকলেই হল আর কি ?"

দুই ভাইএ তাহার পর কিছুক্ষণ ধরিয়া বিশেষ মিল দেখা যায়। রাঙাদার সাহায্য করিতে-করিতে দুজনে মাঝে-মাঝে আড়চোখে পরস্পরের দিকে তাকাইয়া হাসে। রাঙাদার গোপন অভিসন্ধি যে তাহারা ধরিয়া ফেলিয়াছে ইহাতে আর ভুল নাই।

কিন্তু মা আসিয়া অকালে এ-কল্পনা ভাঙিয়া দেন। প্রদ্যোত জঙ্গল প্রায় শেষ করিয়া ফেলিয়াছে। ঘর্মাক্ত কলেবরে বাকি গাছপালার উচ্ছেদ-সাধনে সে ব্যস্ত। মা আসিয়া ভর্ৎসনা করেন। বেলা হইয়া গিয়াছে, খাওয়া-দাওয়া করিতে হইবে। কি হইবে মিছামিছি এই জঙ্গল সাফ করিয়া।

আর গোপনতা চলে না। প্রদ্যোত হাসিয়া বলে—"মিছিমিছি সাফ করছি নাকি! তরিতরকারির বাগান কি রকম করি মা দেখ!" মা এসব খেয়ালে অভ্যস্ত। তিনি নীরবে একটু হাসিয়া বলেন—"আচ্ছা, এখন তো খেতে চল!"

কিন্তু দুই ভাইএ বাঁকিয়া দাঁড়ায়! কোথায় আকাশস্পর্শী মন্দির আর কোথায় তরিতরকারির বাগান! দুই ভাইয়ের কল্পনা সত্যি-সত্যিই যে ধূলিসাৎ হইতে চলিয়াছে! কমল রাগ করিয়া বলে—"বাঃ, বাগান কেন ? মন্দির করবে না রাঙাদা ?"

প্রদ্যোত অবাক হইয়া বলে—"মন্দির! মন্দির তুই কোথায় পেলি ?"

"বাঃ, ছোড়দা যে বললে, গোঁসাইদের চেয়ে বড় মন্দির হবে!"

সকলে হাসিয়া ওঠে। প্রদ্যোত তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলে—"মন্দিরের চেয়ে বাগান যে অনেক ভালো! তরিতরকারি হবে! কতরকম ফল!"

কমল কিন্তু সান্ত্বনায় ভোলে না। তরিতরকারি তো বাজারে কিনিলেই পাওয়া যায়। তাহার জন্য এত কষ্ট করা কেন? মন্দির গড়িয়া দিবার প্রতিশ্রুতি শেষ পর্যন্ত রাঙাদাকে দিতেই হয়।

প্রদ্যোতের জীবন পরিপূর্ণ। কোনোখানে কোনো ফাঁক বুঝি তাহার আর নাই। নূতন মাটিতে আশ্রয় পাইয়া তাহার ক্ষুধিত মনের শিকড় সে বহুদূর পর্যন্ত চালাইয়া দিয়াছে, বাঁধিয়াছে নিজেকে সহস্র শিরা উপশিরার বন্ধনে।

কোনোদিন যে সে এ-পরিবারের বাহিরের লোক ছিল একথা মনে করিবারই প্রদ্যোতের অবকাশ নাই। এই পরিবারটিও অসঙ্কোচে তাহাকে আপনার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এত সহজে, এত স্বাভাবিকভাবে স্বীকার করিয়াছে যে, কৃত্রিম ভাবের কোনো চিহ্নও আর চোখে পড়ে না।

প্রদ্যোত তাহার নূতন মেসে দারবাক হইতে চিঠি পায়। মা নির্মলাকে দিয়া লিখাইয়াছেন যে বিমল অত্যন্ত দুরন্ত অবাধ্য হইয়াছে। প্রদ্যোত না থাকিলে তাহাকে শাসন করিয়া রাখা দায়। তারপর বিমলের নূতন অপকীর্তির কথা সবিস্তারে লিখিয়া জানাইয়াছেন যে পড়াশুনার ধার দিয়াও যায় না। প্রদ্যোত যেন তাহাকে কলিকাতায় নিজের কাছে রাখিয়া পড়াইবার ব্যবস্থা করে। নহিলে ছেলেটা একেবারে মূর্খ হইয়া থাকিবে।

নির্মলার হস্তাক্ষর এইখানেই শেষ। পরের কথাগুলি দিদিকেই বাঁকাচোরা অক্ষরে কোনো মতে লিখিতে হইয়াছে। বোঝা যায় যে নির্মলাকে কোনো মতেই আর সেটুকু লিখিতে রাজী করানো যায় নাই। দিদি অবশ্য নির্মলার বিবাহের কথাই লিখিয়াছেন। প্রদ্যোত খোঁজ-খবর

করিতেছে তো? মেয়ে এদিকে যে-রকম মাথাচাড়া দিয়া উঠিতেছে আর বেশি দিন বিবাহ না হইলে দেশে অত্যন্ত নিন্দা হইবে।

ইহার পর চিঠিতে নানা ফাই-ফরমাসের কথা—কলিকাতায় ফিরিবার সময় এবার প্রদ্যোতকে বলিতে যাহা ভুল হইয়াছে তাহার ফর্দ। পুরানো লণ্ঠনটি বিমল সেদিন ভাঙিয়া ফেলিয়াছে, একটা লণ্ঠন হইলে ভালো হয়। আর কমলের এক জোড়া কাপড়ের অত্যন্ত প্রয়োজন। এবারে নির্মলার জন্য ক্রুশকাঠি কিনিয়া আনিতে কোনো মতেই যেন ভুল না হয় তাহা হইলে তাহার অভিমানের আর অন্ত থাকিবে না—ইত্যাদি।

এ-সমস্ত ফরমাস অসঙ্কোচেই করা হইয়াছে। করা হইয়াছে সহজ অধিকারের দাবিতে। উভয়পক্ষে কোথাও কোনো দ্বিধা নাই। এবং সেইজন্যই প্রদ্যোত এমন সহজে নিশ্চিন্তভাবে নিজেকে নূতন জীবনে মিলাইয়া দিতে পারিয়াছে।

প্রদ্যোতের কাজ আজকাল অনেক। নূতন আর একটা টিউশনি সে সংগ্রহ করিয়াছে; পয়সা বাঁচাইবার জন্য পুরাতন বোর্ডিং ছাড়িয়া নূতন এক মেসে উঠিয়াছে। এখানে খরচ কম হয়। দারবাকের অভাব অনেক। প্রদ্যোতকে উপার্জনের পরিমাণ বাড়াইতেই হইবে। উপায় সে এখনো অবশ্য খুঁজিয়া পায় নাই কিন্তু তাহার চেষ্টারও অন্ত নাই। তাহার মনে যেন দুঃসাধ্য সাধনের নেশা লাগিয়াছে। আকাশ-কুসুমও মাঝে-মাঝে সে কল্পনা করে এই পরিবারটিকে কেন্দ্র করিয়া। কোনো রকম ব্যবসা করিয়া হঠাৎ বড়লোকও তো সে হইয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে কী না সে করিবে। মনে-মনে সে দারবাকে পাকা দালানের হিসাবও বুঝি করিয়া ফেলে। স্বপ্ন দেখে আরো অনেক কিছুর! পয়সার অভাবেই নির্মলার জন্য ভালো সম্বন্ধ সে খুঁজিতে

পারিতেছে না। যেখানে-সেখানে নির্মলার বিবাহ দেওয়া তো চলে না!

প্রদ্যোতের সমস্ত চিন্তা এখন ভবিষ্যতের, অতীতের বিস্মৃতি আর বুঝি তাহাকে পীড়া দেয় না। কিন্তু সত্যই তো তাহা নয়। গভীর রাত্রে এক-একদিন সে বিনিদ্র ভাবে ঘরে পাইচারি করিয়া বেড়ায়। অতীতের বিস্মৃতি এখন নূতন ভাবে তাহার কাছে বিভীষিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একদিন অন্ধকার যবনিকা সরাইতে না পারিয়া সে হতাশ হইয়াছে, আজ তাহার ভয় পাছে সে যবনিকা হঠাৎ অপসারিত হইয়া যায়! সমস্ত মন দিয়া সে প্রার্থনা করে যাহাতে এ যবনিকা না উঠিয়া যায়।

এই যবনিকার পারে কী আছে কে জানে! কৌতূহল তাহার না হয় একটু এমন নয়, কিন্তু আশঙ্কা হয় অনেক বেশি। সেই পুরাতন জীবন আবার তাহাকে এখানকার সমস্ত মূল উৎপাটন করিয়া টানিয়া লইবে এ-কথা ভাবিতেই সে শিহরিয়া ওঠে। ভালো হউক মন্দ হউক ঢাকা যখন পড়িয়াছে তখন সে জীবন আর যেন অনাবৃত না হয়—ইহাই তাহার এখন একান্ত কামনা।

পথে কেহ হঠাৎ ডাক দিলে আজকাল সে চমকাইয়া ওঠে। কে জানে অতীতের কোনো প্রতিনিধি অকস্মাৎ তাহার জীবনে উদয় হইল কিনা। নূতন জীবনের চিন্তাতেই সে নিজেকে মগ্ন করিয়া রাখে, কোনো অসতর্ক মুহূর্তে পাছে মনের কোনো ছিদ্রপথে হঠাৎ তাহার পুরাতন জীবন দেখা দেয়।

সেদিনও শনিবার। হাওয়ায় শীতের আমেজ লাগিয়াছে। আকাশে

আসন্ন শীতের অপরূপ ধূসরতা। প্রদ্যোত দাওয়ার উপর মাদুর পাতিয়া বিমলের সারা হপ্তার পড়াশুনার হিসাব লইতেছিল। এমন সময় মা আসিয়া দাওয়ার একধারে বসিলেন।

মায়ের শরীর কিছুদিন হইতে অত্যন্ত খারাপ। ঘর হইতে বড় একটা বাহির হইতে পারেন না।

প্রদ্যোত তাই কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—"আপনি আবার বাইরে এলেন কেন মা ? আমি এখুনি যাচ্ছিলাম।"

"না, ঘরের ভেতর তো রাতদিনই আছি। এক-একবার না বেরুলে হাঁপিয়ে উঠি।"

মায়ের বাহিরে আসিবার কারণ কিন্তু অন্য। খানিক বাদেই তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে ; একথা-ওকথার পর মা খানিক বাদেই আসলকথা পাড়িলেন।

"—সরকার বাড়ি থেকে আবার লোক এসেছিল বাবা।"

মা এইটুকু বলিয়াই চুপ করিলেন, তারপর প্রদ্যোতের মুখের দিকে খানিক উৎসুক ভাবে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—"ওরা বড় পেড়াপীড়ি করছে।" প্রদ্যোত একটু হাসিয়া বলিল—"সেইজন্যেই তো ভয় মা! ছেলের পক্ষ থেকে অত গরজ ভালো নয় !"

এসব কথা অনেকবার হইয়া গিয়াছে। গ্রামেরই একটি বাড়ি হইতে নির্মলার বিবাহের প্রস্তাব আসিয়াছিল। টাকা-পয়সা বেশি লইবে না। মেয়ে বরপক্ষের আগে হইতেই পছন্দ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং অসুবিধা বিশেষ কিছু নাই। কিন্তু ছেলেটি নেহাত অকর্মণ্য বলিয়া প্রদ্যোত কিছুতেই রাজী হয় নাই।

মা'রও পূর্বে অমত ছিল, কিন্তু দিন যতই যাইতেছে মেয়ের বিবাহের

জন্য দুশ্চিন্তাও তাঁহার হইতেছে তত বেশি। অর্থবল নাই, মেয়ের জন্য ভালো পাত্র পাওয়া সম্বন্ধে তিনি ক্রমশই হতাশ হইয়া পড়িতেছেন। আজ তাই তিনি একটু ক্ষুণ্ণস্বরে বলেন—"ভালো পাত্রের আশায় আর কতদিন বসে থাকবো বাবা! মেয়ের বয়েস যে বেড়েই চলেছে! আর আমাদের মতো অবস্থার লোকের এর চেয়ে কত ভালো পাত্র মিলবে?"

প্রদ্যোত চুপ করিয়া রহিল। ছেলেটিকে সে নিজের চক্ষে দেখিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে খোঁজ-খবরও লইয়াছে। জানিয়া শুনিয়া একটা অপদার্থের হাতে নির্মলাকে তুলিয়া দিতে কিছুতেই তাহার মন চাহে না। এ তাহারই পরাজয়। নূতন জীবনের প্রথম দুরূহ বাধার সামনেই সে কেমন করিয়া হার মানিবে!

মা আবার বলিলেন—"আমার আর অমত করতে সাহস হয় না বাবা! হয়তো ভাগ্যে শেষে এমনও জুটবে না!"

প্রদ্যোত কিছু বলিবার পূর্বে মা বলিলেন—"কাল ওরা আবার আসবে। আমি বলেছি এবার কথা দেব!"

খানিক নীরব থাকিয়া প্রদ্যোত বলিল—"আচ্ছা, তাই দেবেন।"

তারপর অনেকক্ষণ নীরবে সে দাওয়ার উপর বসিয়া রহিল। রাঙাদার কাছ হইতে পড়াশুনা সম্বন্ধে আর কোনো অস্বস্তিকর প্রশ্ন না পাইয়া বিমল এক সময়ে চুপিচুপি, নিশ্চিন্ত হইয়া পলায়ন করিল। সন্ধ্যার ধূসরতা ক্রমশ গাঢ় হইয়া মিশিয়া গেল রাত্রির অন্ধকারে। উঠানের পাশে তুলসীমঞ্চে কখন দিদি বা নির্মলা আসিয়া দীপ জ্বালিয়া গিয়াছে কে জানে! মা-ও অনেকক্ষণ উঠিয়া গিয়াছেন। শুধু প্রদ্যোতেরই যেন সাড়া নাই। সামান্য এই সম্মতি দেওয়ার ভিতর এত বেদনা ছিল কে জানিত!

রাত্রে অদ্ভুত এক ব্যাপার ঘটিল। প্রদ্যোত অন্তত তাহার সচেতন মনের দূর-দিগন্তেও ইহার আভাস বুঝি পায় নাই। খাওয়া-দাওয়া সারিয়া রাত্রে প্রদ্যোত ঘরে ঢুকিতেছিল। নির্মলা তখন বিছানা করিয়া মশারি ফেলিতেছে। প্রদ্যোত চৌকাঠে দাঁড়াইয়া হাসিয়া বলিল—"আর অত যত্ন করে মশারি গুঁজে দরকার নেই। দুদিন বাদে তো নিজেকেই করতে হবে। এখন থেকেই অভ্যেস করে রাখি।"

নির্মলা উত্তর দিল না। কথাটা সে যে শুনিতে পাইয়াছে তাহার আভাসও ব্যবহারে তাহার পাওয়া গেল না। মশারি গুঁজিতে সে তখন তন্ময়।

"ঈস, সুখবরটা শুনেই যে পায়াভারি হয়ে গেছে! এখনই মুখে কথা নেই। দুদিন বাদে বোধ হয় চিনতেই পারবে না!"

এবার নির্মলা মুখ ফিরাইল। আসন্ন ঝড়ের আকাশের মতো সে-মুখ থম্‌থম্ করিতেছে রুদ্ধ আবেগে।

প্রদ্যোত এমন মুখ দেখিবে বলিয়া আশা করে নাই। প্রথমটা সে যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার পর একটু সামলাইয়া আবার পরিহাসের চেষ্টা করিয়া বলিল—"বাগড়া দিয়েছিলাম বলে বুঝি আমার ওপর রাগ! আমি···"

কিন্তু কথা আর তাহাকে শেষ করিতে হইল না। নির্মলা অকস্মাৎ বিছানার উপর আহত পাখির মতো লুটাইয়া পড়িয়াছে। প্রচণ্ড কান্নার বেগ রোধ করিবার চেষ্টায় দুলিয়া উঠিতেছে তাহার দীর্ঘ এলায়িত দেহ। প্রদ্যোত একেবারে বিমূঢ় হইয়া গেল। কি করিবে কিছুই সে ভাবিয়া পাইল না, অনেকক্ষণ কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে মৃদুকণ্ঠে ডাকিল—"নির্মলা!"

নির্মলার তবু সাড়া নাই।

কাতরভাবে সে এবার বলিল—"কী হয়েছে আমায় বল নির্মলা।" নির্মলার নিঃশব্দ কান্না কিন্তু তবু থামিল না। কোনো উত্তরও মিলিল না।

প্রদ্যোত ক্রমশ অস্থির হইয়া উঠিতেছিল, ব্যথিত কণ্ঠে বলিল—"ছিঃ, কী হচ্ছে নির্মলা! কেউ দেখলে কি বলবে!"

নির্মলা এবার উঠিয়া বসিল। মুখ তাহার নত; কিন্তু তবু দুই গাল বাহিয়া অশ্রুর যে-ধারা নামিয়াছে তাহা লুকানো রহিল না। প্রদ্যোত অন্ধ তো নয়। মৃদুকণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল—"এ-বিয়েতে তোমার মত নেই নির্মলা? বল লজ্জা কোরো না!"

"জানি না।" বলিয়া হঠাৎ আবার রুদ্ধ কান্নায় ফুঁপাইয়া উঠিয়া সে সবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

প্রদ্যোত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু বিমূঢ়তা আর তাহার নাই। নির্মলার নিঃশব্দ কান্নার জোয়ারের আঘাতে তাহার অবচেতন মনের অনেক কিছু হঠাৎ ভাসিয়া উঠিয়াছে।

নির্মলার অপ্রত্যাশিত কান্নার হেতু সে জানে, নিজের মনের গোপনতম অনুভূতিও আর তাহার অজ্ঞাত নয়।

এগারো

সে রাত্রি প্রদ্যোত জাগিয়া কাটাইল।

নিজেকে এমন করিয়া চিনিতে পারিয়া প্রথমটা তাহার বিস্ময় যতটা না হইল, বিরক্তি হইল, তাহার চাইতে অনেক বেশি। মনে হইল, তাহার এতদিনের জীবনের শুভ্র সাধনা কেমন করিয়া যেন কলঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। তাহার আনন্দের সৃষ্টিতে পড়িয়াছে স্বার্থের ছায়া।

এ-সংসারে সে আশ্রয় পাইয়াছে সত্য; কিন্তু তাহার চেয়েও বড় সত্য এই যে, অমলবাবুর পরিবারটিকে নূতন করিয়া সে সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছে। সে-সৃষ্টির ভিতর কোনো সংকীর্ণ উদ্দেশ্য ছিল না বলিয়াই তাহার বিশ্বাস। আজ হঠাৎ নির্মলার কান্না তাহার সে ভুল নিষ্ঠুরভাবে ভাঙিয়া দিয়াছে। তাহার সমস্ত নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টার ছদ্মবেশে এমনি একটি কামনা ছিল মনে করিয়া সে সঙ্কুচিত হইয়া ওঠে। তাই নিজের প্রতি আক্রোশে এই গোপন কামনাকে গভীর অভিসন্ধি মনে করিয়া সে আত্মভর্ৎসনা করে।

কেবলই তাহার মনে হয় যে, এমন না হইলেই পারিত। অহৈতুক জীবনবিলাসের আনন্দে সে এই পরিবারটিকে সাহায্য করিতে চাহিয়াছে। ইহারা তাহাকে আপন করিয়া লইতে যে দ্বিধা করে নাই তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা তো ছিলই, সে-কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহারও অধিক কিছু করিতে চাহিয়াছে। সেই

অতিরিক্ত অহৈতুক আত্মদানের ভিতরই তাহার অন্তরের ছিল গভীর তৃপ্তি ও গৌরব।

সে বুঝিতে পারে এখন হইতে সেই নির্মল আত্মপ্রসাদের প্রশান্তি তাহার আর থাকা সম্ভব নয়। সব কিছুর রঙ বদলাইয়া গিয়াছে একটি মুহূর্তে। হয়তো নূতন সুর লাগিয়াছে তাহার জীবনে, হয়তো কেন, সত্যই যে জীবনের নূতন বিস্ময় তাহার কাছে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, একথা অস্বীকার করিয়া কোনো লাভ নাই ; কিন্তু তবু তাহার শান্তি নাই। যে-আনন্দ তাহার হৃদয়ে গুঞ্জন করিয়া উঠিতেছে, তাহারই জন্য সে লজ্জিত। অকারণে আপনাকে সে বিলাইতে চাহিয়াছিল, লাভের লোভে নয়। অপ্রত্যাশিত এই আনন্দের মূল্য পাইয়া তাই যেন সে সঙ্কুচিত হইয়া ওঠে। এ আনন্দকে অস্বীকার করিতে না পারিলেই সে যেন অত্যন্ত ছোট হইয়া যায়।

এ-আত্মগ্লানি কিন্তু প্রদ্যোতের স্থায়ী হয় না, ধীরে-ধীরে তাহার মনে সন্দেহ জাগে। এ-প্রেম হয়তো লজ্জাকর, কিন্তু এ-আনন্দকে অস্বীকারই বা সে কেমন করিয়া করিবে ? আর সত্যই একি এমন লজ্জার ব্যাপার ! তাহার আত্মপ্রসাদের প্রশান্তির তুলনায় এ-আনন্দকে তুচ্ছ করিয়া দেখিবার কী হেতু আছে ! যেমন করিয়া যে-পথেই আসুক, এই প্রেমকে আর বাধা দেওয়াও বুঝি চলে না। সে বুঝিতে পারে, তাহার সত্তার গভীর গোপন প্রদেশেও শাখায় প্রশাখায় আনন্দের এই ধারা সঞ্চারিত হইয়া গেছে। এতদিন কেন সে সচেতন হয় নাই, এইটুকু বিস্ময়ের ব্যাপার। আর সচেতন সত্যই সে কি হয় নাই ! কে জানে ! হয়তো এটুকুও তাহার আত্মপ্রবঞ্চনা, আপনার কাছে সে ধরা দিতে চায় নাই। কোথায় হয়তো ছিল তাহার মহত্ত্বের দুর্বল মোহ ; আত্ম-

প্রসাদকে ক্ষুণ্ণ করিবার ভয়ে নিজের কাছে নিজেকে সে আড়াল করিয়াছে। মাঝ রাতে প্রদ্যোত দরজা খুলিয়া বাহিরের রকে আসিয়া দাঁড়াইল। গাঢ় শীতল অন্ধকার। শুধু তারাগুলি ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে নূতন মাজা জহরতের মতো। পৃথিবী মুছিয়া গেছে, আছে সত্য শুধু জ্যোতিঃকণা-সিঞ্চিত আকাশ। নীরবে খানিক দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে কী যে হইয়া গেল কে জানে! দিন-রাত্রির দুয়ের অর্থ যেন প্রদ্যোত হঠাৎ নূতন করিয়া উপলব্ধি করিল, নূতন করিয়া জানিল রাত্রির ব্যাখ্যা।

পৃথিবী, দিনের এই পৃথিবী, এই সব নয়। আপনাকে ভুলিলে চলিবে না, ভুলিলে চলিবে না জ্যোতির্বিন্দুর অসীমতার ইঙ্গিত। মানুষ তবু ভোলে, মত্ত হইয়া থাকে নিকটের নেশায়, সৃষ্টির আধখানা অর্থ লইয়া নিজেকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে।

তার পর আসে রাত্রি, সৃষ্টির অর্থকে প্রসারিত করিয়া দেয় অসীমতায়, জীবনের অনন্ত পটভূমিকে প্রকাশ করিয়া তাহার গূঢ়তম রহস্যকে স্পষ্ট করিয়া তোলে। প্রদ্যোত অনুভব করে তাহার মধ্যে এই অন্ধকার আকাশ—অসীম জ্যোতির্বিন্দুসঞ্চিত আকাশ স্পন্দিত হইতেছে। সে আকাশের ইঙ্গিতে, গভীর রহস্যময় ইঙ্গিতে জীবন তাহার নূতন ব্যঞ্জনায় দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

এ-আকাশ উদ্ঘাটিত হইল কেমন করিয়া, তাহার সত্তার গোপন কেন্দ্রের এই আকাশ! নূতন জীবনে প্রদ্যোত এত কাল যেন শুধু দিনের পৃথিবীতে জাগিয়াছিল, আজ সহসা আসিয়াছে রাত্রি, অসীম রহস্যের সুদূর-প্রসারী ইঙ্গিত লইয়া। এ-রাত্রি কি শুধু এই মেয়েটির অশ্রুস্রোতে ভাসিয়া আসিল তাহার সত্তার রহস্য-কেন্দ্র হইতে!

খানিক দাঁড়াইয়া থাকিয়া, বাহিরের ও অন্তরের এই অসীম আকাশের ব্যাপ্তি অনুভব করিতে-করিতে প্রদ্যোতের মনে হইল, মিথ্যাই সে নিজের সহিত অর্থহীন দ্বন্দ্বে নিজেকে ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে। কী মূল্য তাহার আত্মপ্রসাদের ? সব চেয়ে বড় সত্য তাহার জীবনে আজ এই রাত্রির আকাশ, যে-আকাশ তাহার জীবনে এতদিন আড়াল হইয়াছিল। এই আকাশ আবিষ্কার করিয়া সে আজ ধন্য, ইহার চেয়ে বড় সার্থকতা আর তাহার কিছু হইতে পারে না। তাহার আত্মা আজ এই দুই আকাশের মহাসঙ্গমের মাঝে নূতন চেতনার বিস্ময়ে যেন স্পন্দিত হইতেছে, এই চেতনাকে সে কি অস্বীকার করিবে তুচ্ছ আত্মপ্রসাদের মোহে ?

না, আবার তাহাকে নূতন ভাবে জীবনের সম্মুখীন হইতে হইবে। জীবনে দুঃসাহসেরও প্রয়োজন আছে—আপনাকে সত্য করিয়া উপলব্ধি করিবার দুঃসাহস। হয়তো পুরাতন সব প্রত্যয়ের মূলে আঘাত লাগিবে, হয়তো আসিবে অশান্তি, তবু এই সদ্য আবিষ্কৃত আকাশকে ভুলিতে সে তো পারিতেছে না, যে-আকাশ কাঁপিতেছে নীহারিকা-সম্ভাবনার উত্তেজনায়। এই প্রেমকে স্বীকার সে করিবে, যে-প্রেম প্রত্যহের সংকীর্ণ সীমা ভাঙিয়া আনিয়াছে অন্তহীন আকাশের উপলব্ধি, জীবনের অর্থকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছে সৃষ্টির গূঢ় রহস্যে। বিস্মৃতির যবনিকার পারে নূতন জীবন সে পাইয়াছে ; শুধু শান্তির লোভে, অর্ধ সত্যের সহিত রফা করিয়া এ-জীবন সে ব্যর্থ করিবে কেন ?

কিন্তু বাধা অনেক। মানুষ আকাশকে আড়াল করিয়া দিনের পৃথিবীর

সংকীর্ণ সীমায় বাস করে। দিনের আলোকেই তাহাদের পরিচয়ের বিনিময়, জীবনের রীতি ও নীতি মানুষ গড়িয়া তুলিয়াছে সেই আলোকেই। রাত্রির আকাশের সহিত সম্বন্ধ তাহার জীবনের নাই। প্রদ্যোতের গভীরতম উপলব্ধি তাই এই জগতে অর্থহীন। দিনের আলোকে রাত্রির সম্বন্ধ তাহার নিজের কাছেই কেমন অশোভন, কেমন কুৎসিত মনে হয়। মনের সমস্ত অভ্যাস আসিয়া তাহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায়।

রাত্রে ছিল তাহার অগ্নিশিখার মতো নগ্ন, প্রদীপ্ত উপলব্ধি। দিনের আলোয় তাহা একেবারে ম্লান হইয়া যায়। কত কথাই তো ভাবিবার আছে। রাত্রির আকাশের তলায় নির্মলা ছিল নিখিল নারীর প্রতীক, তাহার অস্তিত্বের রহস্যমুকুর—যে-মুকুরে নিজেকে সে সবিস্ময়ে আবিষ্কার করিবার অভিযান করিতে চায়। দিনের আলোয় মনে পড়ে নির্মলা একটি পনেরো বছরের এই পরিবারের অনূঢ়া মেয়ে মাত্র। তাহার সংসার আছে, সে-সংসারের অনেক সংস্কার অনেক রীতিনীতি আছে, সব জড়াইয়া আছে সমাজের অনুশাসন।

নির্মলাকে সে কেমন করিয়া কামনা করিতে পারে? সামাজিক মানুষ হিসাবে তাহার কোথায় স্থান, সে তো কিছুই জানে না। মিথ্যার আশ্রয় লওয়া ছাড়া সামাজিক রীতিকে ফাঁকি দিবার কোনো উপায় তো নাই। কেমন করিয়া সে তাহা করিবে?

তা ছাড়া স্বাভাবিক সংকোচও আছে। কেমন করিয়া সে নিজে হইতে আজ একথা পাড়িতে পারে! সমস্ত সংকোচ অতিক্রম করিয়া কোনো রকমে কথা তুলিলেও সেকথা থাকিবে কেন?

সকাল বেলা কেহ উঠিবার আগেই প্রদ্যোত বাড়ি হইতে বাহির হইয়া

গিয়াছিল। গ্রামের উপর ঘন হইয়া কুয়াশা জমা হইয়া আছে। সেই কুয়াশার আবরণে সমস্ত গ্রামকে কেমন পরিত্যক্ত মৃত বলিয়া মনে হয়—সেখানে মানুষ আর নাই, অশরীরী ছায়ারা তাহাদের প্রাচীন বিচরণ-ক্ষেত্র আশ্রয় করিয়া আছে মাত্র।

নিজেকেও তাহার কেমন অশরীরী বলিয়া মনে হয়। কুয়াশায় সমস্ত গ্রামের মতো তাহারও বাস্তব সত্তা যেন গলিয়া অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। আছে শুধু ছায়া। সে-ছায়া জীবনের বিকৃত অনুকরণ করিয়া চলিতেছে মাত্র। সত্যকার জীবনকে আশ্রয় করিবার জন্য তাহার আকুলতার অন্ত নাই, কিন্তু তবু সে নিরুপায়।

গ্রামের ভিতর নানা পথ ধরিয়া প্রদ্যোত অনেকক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইল। কুয়াশা সরিয়া গেল বেলা বাড়িবার সঙ্গে, কিন্তু প্রদ্যোতের অস্থিরতা গেল না।

আজ রবিবার। এতক্ষণে ঘুম হইতে উঠিয়া কমল-বিমল রাঙাদাকে খুঁজিয়া হায়রান হইতেছে, তাহা প্রদ্যোত জানে। আজ তাহাদের অনেক কিছু করিবার কথা। বাহিরের উঠানে পরিষ্কৃত একটুখানি জমিতে প্রদ্যোত কপির চারা লাগাইয়াছিল। সে-কপি ভালো রকম বাড়িতেছে না। জমিটার ভালো করিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে। বাড়ির ভিতর লাউয়ের লতা অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। একটা মাচা তৈয়ারি করাও প্রয়োজন।

কিন্তু প্রদ্যোত কিছুতেই উৎসাহ পায় না। মনের সে-প্রশান্তি তাহার কোথায়? নিজের সহিত একটা বোঝাপড়া না করিলে আর নূতন জীবনে শান্তি তাহার মিলিবে না, সে বুঝিতে পারিয়াছে। জীবনের তাহার যে-সমস্যা আসিয়া দেখা দিয়াছে, তাহার নিষ্পত্তি তাহাকে

করিতেই হইবে অবিলম্বে। এড়াইয়া গিয়া কোনো লাভ নাই। গতকাল ও বর্তমান দিনটির মধ্যে বিরাট-যে ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাকে অস্বীকার করিলেই তাহা মিথ্যা হইয়া যাইবে না। আগের দিনের সে নিশ্চিত শান্তি সত্যই আর তাহার নাই। বিগত রাত্রিকে ভুলিয়া একান্ত প্রশান্ত মনে শুধু এই পরিবারটির সাহায্যে নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়া সে আর তৃপ্ত হইবে না। মহানুভবতার মোহে নিজেকে আচ্ছন্ন করিয়াও নয়। আর অত বড় ফাঁকি নিজেকে সে দিতে চাহে না।

অনেক বেলায় সে বাড়ি ফিরিয়া গেল। কমল-বিমল রাঙাদার রহস্যজনক অন্তর্ধানে প্রথমত অবাক হইয়াছিল, তাহার পর অভিমান করিয়াছে।

বিমল সে-অভিমান বজায় রাখিল, কিন্তু কমলের রাঙাদাকে অভিমানের কথাটা না জানিতে দেওয়া সমীচীন মনে হইল না। সবে সে স্নান সারিয়াছে। ভিজা অবাধ্য চুলের ভিতর বৃথাই টেরি কাটিবার চেষ্টা করিতে-করিতে সে রাঙাদাকে শুনাইয়া-শুনাইয়া বলিল—"বড়দি, আজ আমি আলাদা ভাত খাব। কারও সঙ্গে আমাকে দিও না যেন!"

বড়দি রান্না-ঘরের দাওয়ার পিঁড়ি পাতিতেছিলেন, ব্যাপারটা না বুঝিয়াই বলিলেন—"কেন রে! তোর ছোড়দার সঙ্গে আবার কী হল? তার পাত আবার কোথায় করব তাহলে?"

বড়দিদির বুদ্ধির অভাবে একটু বিরক্ত হইয়া কমল বলিল—"ছোড়দার পাত করতে বুঝি আমি বারণ করেছি, বলছি আমি কারুর সঙ্গে খাব না!"

এবার উঠানে প্রদ্যোতকে দেখিতে পাইয়া বড়দি ব্যাপারটা বুঝিলেন। হাসিয়া বলিলেন—"ওঃ, এই ব্যাপার! সত্যি তোমার তো ভারি অন্যায় বাপু, প্রদ্যোত, সকাল থেকে তোমার মালি-মজুর দুজনে হা পিত্যেশ করে বসে, তুমি না বলে কয়ে কোথায় গিয়েছিলে, যেমনি গিয়েছিলে তেমনি শাস্তি ভোগ কর। কমল আজ তোমার সঙ্গে খাবেই না। দেখি, আজ কেমন করে তোমার পেট ভরে!"

তাহাদের গুরুতর অভিযোগের ব্যাপারটা এমন করিয়া পরিহাসে হালকা হইতে দিতে বিমল রাজী নয়। তাছাড়া 'হা পিত্যেশ' করিয়া বসিয়া থাকার কথাটা অপমানজনক বলিয়াই তাহার মনে হয়। এতক্ষণ সে চুপ করিয়াছিল, এইবার হঠাৎ শূন্য আকাশকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"আমরা নিজেরা একটা বাগান করছি।" তাহার পর কমলকেও দলে টানা প্রয়োজন বোধ করিয়া বলিল—"খুব ভালো একটা জায়গা দেখে এসেছি না রে, কমল?"

কমল দাদার কথার মারপ্যাঁচ অত না বুঝিয়া বলিয়া ফেলিল—"কোথায়?"

বিমল চটিয়া উঠিয়া ভেংচাইয়া বলিল—"কোথায়? হাবা কোথাকার!" বড়দি হাসিয়া উঠিলেন। প্রদ্যোতও সে-হাসিতে যোগ দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু যেন আড়ষ্টভাবে। এই পরিবারটির সহিত সম্বন্ধে কিছুতেই আজ সে যেন আর সহজ হইতে পারিতেছে না। সাধারণ প্রাত্যহিক ব্যাপারে স্বাভাবিক ভাবে যোগ দিবার ক্ষমতা তাহার যেন নাই। অথচ এমনি হাস্য-পরিহাস আনন্দ লইয়াই এতদিন সে সম্পূর্ণভাবে তৃপ্ত ছিল। কেমন করিয়া সে নিজেই নিজেকে দূর করিয়া ফেলিয়াছে একদিনে—ভাবিয়া তাহার বিস্ময় লাগিল।

বিকালবেলা হঠাৎ একটা জরুরি কাজের অছিলায় প্রদ্যোত কলিকাতা রওনা হইয়া গেল। বাড়ি হইতে স্টেশন পর্যন্ত আসিবার সময়ে সমস্ত চিন্তা সে যেন জোর করিয়া ঠেলিয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু ট্রেনে উঠিয়া বসিবার পর আর নিজের কাছে সত্যটাকে গোপন করা গেল না। সে পলাইয়া আসিতেছে। সত্যই ভীরুর মতো জীবনের নবোদ্ঘাটিত সত্যের সম্মুখীন হইবার, জীবনে তাহার মূল্য স্বীকার করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। সে তাই পাশ কাটাইয়াছে।

কলিকাতাগামী রবিবারের বিকাল বেলার ট্রেন। লোকজন নাই বলিলেই হয়। একটি কামরায় সে একাই ছিল যাত্রী। ট্রেন ছাড়িয়া দিবার পর জানালা হইতে দ্রুত অপস্রয়মান ধূসর প্রান্তর ও গ্রামের দিকে চাহিয়া থাকিতে-থাকিতে তাহার মন গভীর হতাশায় ভরিয়া গেল। শুধু মাঠ ও গ্রাম নয়, তাহার মনে হইল—নূতন জীবনের সব কিছু সঞ্চয়, সব আশ্রয় তাহার কাছ হইতে সরিয়া যাইতেছে। সরিয়া যাইতেছে হয়তো তাহার দুর্বলতায়, সে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই বলিয়া, ধরিয়া রাখিবার সাহস নাই বলিয়া। যাই হোক, আবার শুরু হইল যে তাহার নিরুদ্দেশ যাত্রা, এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কিন্তু কোথায় সে যাইবে! অন্ধকার দিগন্তে কোনো পথই তো সে দেখিতে পায় না। কোন নিষ্ঠুর দেবতা তাহার জীবনের সূত্র বুনিতেছেন, কে জানে! কে বুঝিবে, কি গভীর তাঁহার অভিসন্ধি! সাধারণ কোনো পথ তাহার জন্য নয়। সহজভাবে শান্তি উপভোগ করিবার অধিকার তাহার নাই। প্রত্যেক মানুষের দেবতাও বুঝি বিভিন্ন। অন্তত যে দেবতা তাহার জীবনের ভার লইয়াছেন, মুখে তাঁহার বরাভয় প্রসন্নজ্যোতি বুঝি নাই। যে-অন্ধকার অসীম আকাশে নক্ষত্রলোকের মাঝে ব্যবধান রচনা

করিয়াছে সেই অন্ধকারে বুঝি তাঁহার আসন। দুর্বোধ তাঁহার অভিপ্রায় দুর্জ্ঞেয় তাঁহার পথ। তিনি তাহার জীবনে অন্ধকার-যবনিকা টানিয়াছেন আপন খেয়ালে। সে-যবনিকা সে ভুলিতে চাহিয়াছিল, সে-অন্ধকার ঢাকিতেছিল নূতন জীবনের রুপালী জাল বুনিয়া; কিন্তু আবার নিষ্ঠুর হাতে সে-নক্সা তিনি ছিঁড়িয়াছেন, জট পাকাইয়া সমস্ত ব্যর্থ করিয়াছেন।

বাহিরে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। কামরার ভিতরের আলো ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। এই নির্জন কামরা যেন ক্রমশ বিচ্ছিন্ন এক জগৎ হইয়া উঠিতেছে তাহারই মনের মতো। পরিচিত পৃথিবী নিমগ্ন হইয়া গেল অন্ধকারে। এখন শুধু ভয়াবহ নিঃসঙ্গতা।

গত দিনটার সমস্ত ব্যাপার আর একবার সে মনে-মনে এখন পর্যালোচনা করে। সে ভীরুর মতো পলাইয়া আসিয়াছে সত্য, দিন ও রাত্রির গভীর উপলব্ধির সম্মান সে যে রাখিতে পারে নাই, একথাও সে জানে, কিন্তু তাহার উপায় কী ছিল?

আপনার মনের এ-পরিচয় পাইবার পর আর নিজের সহিত ভণ্ডামি করিয়া ওই পরিবারের সহিত সহজ সম্বন্ধ রাখা সম্ভব নয়। সে চেষ্টা করিলে শুধু নিজেকেই সে পীড়িত করিত না, আর একটি মেয়ের জীবনেও অনর্থক বেদনার বোঝা বাড়াইয়া তুলিত!

তাহার চেয়ে নির্মলা ভুলিয়া যাক। সেই সুযোগই সে দিতে চায় নিজেকে অপসারিত করিয়া। যেখানে কাহারও সার্থক হইবার উপায় নাই, সেখানে বিস্মৃতিই ভালো। তাহার মন অবশ্য বিদ্রোহ করিয়া বলিয়াছে, সার্থক হইবার উপায় নাই কেন? কিন্তু সত্যই অন্তরের গভীর প্রদেশে সে অনুভব করিয়াছে, মিথ্যার সাহায্যে কোনো সত্যকার সার্থকতা

মিলিতে পারে না। এ-মিথ্যা কখনও প্রকাশ হোক বা না হোক, তাহার মনে গোপন থাকিয়াই সমস্ত জীবন যে বিষাক্ত করিয়া দিবে।

না, তার চেয়ে এই ভালো! নিজেকেই সে নির্বাসিত করিবে। এ নির্বাসনের বেদনা যে কত গভীর তাহা এখনও অবশ্য সে নিজেই ভালো করিয়া উপলব্ধি করে নাই। জীবনের প্রচণ্ড পিপাসা লইয়া সে যাহা কিছু গড়িয়া তুলিয়াছে, যাহা কিছু আশ্রয় করিয়াছে, সমস্তই তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। চারিধারে তাহার অসীম শূন্যতা। প্রথম যেদিন এমনি একটি ট্রেনের কামরায় সে নিজেকে অসহায়ভাবে আবিষ্কার করিয়াছিল, সেদিনও তাহার জগৎ ছিল শূন্য। কিন্তু এ-শূন্যতা তাহার চেয়েও ভয়াবহ, তাহার চেয়েও দুঃসহ।

সেদিন সুদূর দিগন্তে কোথাও কোনো তটরেখা ছিল না। আজ নিজে হইতে প্রিয় ও পরিচিত আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অকূলে সে আপনাকে ভাসাইয়াছে। পিছনের আকর্ষণ প্রচণ্ড, তবু সে ফিরিবে না। তাহার জন্য আছে শুধু অকূল সাগর ও অন্তহীন অন্ধকার। তবু তাই ভালো। সমস্ত বেদনা সে একাই বহন করুক। আর কাহারও জীবনে কোনো ক্ষতচিহ্ন যেন না থাকে!

কলিকাতায় আসিয়া প্রদ্যোত পরের দিনই মা'র কাছে একটা চিঠি লিখিয়া দিয়াছে। লিখিয়াছে যে, এখন তাহাকে দিনকতক কলিকাতাতেই থাকিতে হইবে। দারবাকে আর কিছুদিন সে যাইতে পারিবে না। তাই বলিয়া তাঁহাদের চিন্তার কোনো কারণ নাই, সংসারের সমস্ত বন্দোবস্ত সে এখান হইতেই করিবে।

প্রদ্যোতের হঠাৎ রবিবারেই চলিয়া যাওয়ায়, মা একটু অবাক হইয়াছিলেন। দারবাক হইতে এমন করিয়া হঠাৎ প্রদ্যোত কখনও যায় নাই।

অন্যান্য বারে তাহার ধরন দেখিয়া বোঝা যায় যে, সোমবার নেহাত না যাইলে নয় বলিয়া অত্যন্ত অনিচ্ছা সহকারে সে যাইতেছে। অথচ এবার হঠাৎ তাহার এত তাড়া কেন?

যাইবার সময়ে প্রদ্যোতের ধরনও কেমন তাঁহার অস্বাভাবিক মনে হইয়াছিল। প্রদ্যোত কেমন যেন অন্যমনস্ক, কেমন যেন একটু শঙ্কিত তাহার ভাব। বৃদ্ধার ক্ষীণ দৃষ্টিতেও প্রদ্যোতের অস্থিরতা সেদিন ধরা পড়িয়াছিল।

তিনি সেদিন বিস্মিত হইয়াছিলেন মাত্র। প্রদ্যোতের চিঠি পাইয়া তিনি চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। প্রদ্যোতের অমন ভাবে চলিয়া যাওয়ার পর এরকম চিঠি কেমন যেন অত্যন্ত সন্দেহজনক। কি যেন একটা অস্বাভাবিক কিছু ঘটিয়াছে বলিয়া তাঁহার আশঙ্কা হয়। চিঠি আনিয়াছিল বিমল। রাঙাদাকে রবিবারের ক্রটির জন্য সে এখনও ক্ষমা করে নাই সত্য। সহসা অমন করিয়া চলিয়া যাইবার জন্য রাগও সে ভয়ানক করিয়াছে; কিন্তু তাই বলিয়া রাঙাদার চিঠি হাতে পাইয়া একটু উল্লাস প্রকাশ না করিয়া কেমন করিয়া থাকা যায়!

পিয়নের হাত হইতে চিঠিটা এক রকম কাড়িয়াই লইয়া সারা বাড়ি খানিক সে চীৎকার করিতে-করিতে অস্থির ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইল! চিঠির পাঠোদ্ধার তাহার নিজেরই করিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা আর হইল না। নির্মলা কোথায় ওৎ পাতিয়া ছিল। খপ করিয়া এক সময়ে সে চিঠিটা ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল!

এমন অসময়ে অকারণে প্রদ্যোতের চিঠির কথা শুনিয়া মা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন। নির্মলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রদ্যোত চিঠি দিয়েছে নাকি?"

নির্মলা চিঠির খানিকটা ইতিমধ্যে বুঝি পড়িয়াছে। মায়ের কোলের কাছে চিঠিটা ফেলিয়া দিয়া বলিল—"হ্যাঁ, এই যে—"

মা বলিলেন—"আমায় দিয়ে কি হবে! পড় না কি লিখেছে!" কিন্তু নির্মলার দেখা আর পাওয়া গেল না। অগত্যা বড় মেয়েকে ডাকাইয়াই মাকে চিঠিটি শুনিতে হইল। চিঠির মর্ম জানিয়া কিন্তু তিনি আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না।

অনাত্মীয় এই ছেলেটির উপর তাঁহার গভীর স্নেহ পড়িয়াছিল সত্য। না পড়িয়া উপায় কি? ছেলেটি তাঁহার মৃত পুত্রের স্থান যে সত্যই অধিকার করিয়াছে। শুধু অধিকার নয়, তাহার বেশি কিছু করিয়াছে। এত গভীর ভাবে, এত সহজে সে নিজেকে এ সংসারের সহিত জড়াইয়াছে যে, আজ তাহার অসাধারণ আত্মত্যাগের কথা সব সময়ে মনেও থাকে না।

কিন্তু প্রদ্যোতের সম্বন্ধে স্নেহের অধিক তাঁহার কিছু ছিল, তাহা হয়তো খানিকটা কৃতজ্ঞতা, খানিকটা দীনতা। প্রদ্যোত এপরিবারে বিধাতার আশীর্বাদের মতো আসিয়াছে। ছেলেমেয়েদের কী ব্যবস্থা করিবেন ভাবিয়া যখন তিনি কূল পাইতেছিলেন না, তখন কোথা হইতে আসিয়া প্রদ্যোত তাঁহার সমস্ত দুশ্চিন্তার ভার নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছে। যে সংসারের ভিত্তি পর্যন্ত টলিতেছিল, তাহা সে অসাধারণ অমানুষিক আত্মত্যাগের দ্বারা খাড়া করিয়া রাখিয়াছে। এতখানি সৌভাগ্য আশারও অতীত। এক-এক সময়ে অমলবাবুর মা'র সমস্ত ব্যাপারটা কেমন বিশ্বাস হয় না। কেমন আশঙ্কা হয় যে, ইহা স্থায়ী হইতে পারে না। প্রদ্যোতের উপর নির্ভর করিবার অভ্যাসের দরুনই তিনি যেন আরো দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন। সারা জীবন প্রতিকূল অবস্থার সহিত

যুঝিয়া ও পরাজিত হইয়া তাঁহার নিজস্ব শক্তিও আর নাই। এখন প্রদ্যোতের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হওয়ার চিন্তাই তাঁহার পক্ষে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। এবং এইখানে তাঁহার দীনতা।

সেই দীনতাই আজ বুঝি একটু প্রকাশ হইয়া পড়ে। প্রদ্যোতের চিঠি পাইয়া তিনি শঙ্কিত হইয়া ওঠেন, কিছু বুঝিতে না পারিলেও মনে হয় কোথায় যেন তাঁহাদেরই কোনো অপরাধ বুঝি হইয়া গিয়াছে। জনে-জনে সকলকে ডাকিয়া তিনি প্রদ্যোত কিছু বলিয়া গিয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করেন।

বড় মেয়েকে ডাকিয়া বলেন—"হ্যাঁরে রাগ করে যায়নি তো প্রদ্যোত ?"

বড়দি হাসিয়া বলেন—"তোমার যেমন কথা মা! রাগ করে যাবে কেন ? সে কি তেমন ছেলে!"

মা'র মনের সন্দেহ তবু যায় না, জিজ্ঞাসা করেন, "তোরা কেউ কিছু বলিসনি তো ?"

এবার একটু বিরক্ত স্বরেই বড়দি বলেন—"তোমার কি হয়েছে বলতো ? কি যা-তা ভাবছ! দরকার হয়েছে, তাই কলকেতা গেছে। তার ভেতরও বলাবলি, রাগ—কোথায় পাচ্ছ ?"

মা একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়েন, বলেন—"না, এমনি ভাবছি! হঠাৎ ছুটির দিনেই চলে গেল। আবার এখন আসতে পারবে না লিখেছে!"

বড়দির মন প্রদ্যোত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। এসব আলোচনা তাই তাঁহার কাছে নিতান্ত অর্থহীন মনে হয়!

"লিখেছে যখন, তখন নিশ্চয়ই কাজ আছে।" বলিয়াই বড়দি এবার নিজের কাজে চলিয়া যান।

মা'র মনে-মনে কিন্তু সন্দেহের একটু কাঁটা বিঁধিয়াই থাকে। নিজের

মনে অনেক কিছু পর্যালোচনা করিবার পর সহসা তিনি যেন প্রদ্যোতের অপ্রসন্নতার কারণ আবিষ্কার করেন। পাড়ায় নির্মলার যে-সম্বন্ধ হইতেছে তাহাতে প্রদ্যোতের আপত্তি ছিল তিনি জানেন। তাঁহার মনে হয়, সেই সম্বন্ধের জন্য সেদিন জেদ করিয়া তিনি ভালো কাজ করেন নাই। সব কিছুর ভার যখন সেই লইয়াছে তখন তাহার বিরুদ্ধে যাওয়ার চেষ্টা করা তো উচিত নয়। হয়তো প্রদ্যোত তাহাতেই অসন্তুষ্ট হইয়াছে।

এ-কথা মনে হইবামাত্র প্রদ্যোতকে চিঠি লিখাইবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়েন। নির্মলার বিবাহের কথা, প্রদ্যোতের সম্মতি অনুমান করিয়া তিনি একরকম দিয়াই ফেলিয়াছেন, এই যা বিপদ। কিন্তু তাহা হইলেও, কথা ফিরাইয়া লইয়া পাত্রপক্ষের বিদ্বেষ-ভাজন হইতেও এখন তিনি প্রস্তুত। প্রদ্যোতকে অপ্রসন্ন করা কোনো মতেই চলে না।

চিঠিপত্র সাধারণত নির্মলাই লিখিয়া থাকে। কিন্তু আজ ডাকাডাকি করিয়াও তাহাকে কোনো মতে বিছানা হইতে তুলিয়া আনা যায় না। অসুখের নাম করিয়া সেই যে সে শয্যা আশ্রয় করিয়াছে, আর তাহার উঠিবার নাম নাই। অগত্যা মা বিমলেরই শরণাপন্ন হইলেন এবং তাহার দ্বারা কোনো রকমে অবান্তর আরো অন্যান্য কথার ভিতর এই কথাই জানাইতে চেষ্টা করিলেন যে, প্রদ্যোতের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কাজ তিনি করিবেন, এ-কথা সে যেন না মনে করে।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এ চিঠির পরও এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল; তবু প্রদ্যোতের কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। রবিবারের ছুটিতে সে না হয় আসিতে পারে নাই, কিন্তু একটা চিঠি দিয়া খবর দিতে ও খোঁজ লইতে সে কি পারিত না! তাহার হইল কি?

বারো

এতদিন প্রদ্যোতের পক্ষে নীরব ও নিরুত্তর থাকা সত্যই একটু বিস্ময়কর। দারবাক হইতে প্রথম যে পত্র আসিয়াছিল তাহার উত্তর সে নানা কারণে অবশ্য দিতে পারে নাই। কিন্তু তাহার পরের চিঠিগুলির জবাব সে ইচ্ছা করিয়া দেয় নাই এমন নয়। দিবার কথা তাহার মনে নাই। তাহার জীবন আবার বুঝি দ্বিধাবিভক্ত পথের মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পথ শুধু যে সে ঠিক করিতে পারিতেছে না তাহা নয়, পথ বিচার করিবার সাহস পর্যন্ত তাহার নাই। তাহার অন্তরে আবার আলোড়ন শুরু হইয়াছে। শুরু হইয়াছে গভীর দ্বন্দ্ব।

প্রদ্যোত চিঠির উত্তরে যে কি লিখিবে ভাবিয়া না পাইয়াই নীরব ছিল। এই পরিবারটির জীবন হইতে সে নিজেকে বিলুপ্ত করিতে চায়। কিন্তু তাহার কারণ তো আর সে খুলিয়া লিখিতে পারে না। মা'র চিঠির মধ্যে ব্যাকুলতা ও যে-ভয় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তাহা দূর করিবার জন্য গোটাকতক মিথ্যা কথা বানাইয়া লিখিতেও তাহার ইচ্ছা হয় নাই। সে তাই নীরব থাকাই শ্রেয় বুঝিয়াছিল। সে জানে যে নিজেকে বিলুপ্ত করিতে চাহিলেও এই পরিবারটির সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ছেদন করা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। করিলে কল্যাণের পরিবর্তে এই পরিবারটির সমূহ ক্ষতিই করা হইবে। তাহারা প্রদ্যোতের উপরই নির্ভর করিয়া আছে। সে অকস্মাৎ নিজেকে সরাইয়া লইয়া ইহাদের অকূলে ভাসাইয়া দিতে

পারে না। তাই সে ঠিক করিয়াছিল, দূর হইতে ইহাদের সাহায্যের ত্রুটি করিবে না। কিন্তু ঘনিষ্ঠতা আর নয়। আর সে ইহাদের জীবনে নিজের অশুভ ছায়া জোর করিয়া ফেলিবে না। সেই সঙ্কল্পই প্রদ্যোত অটুট রাখিতে চাহিয়াছিল। কোনো দুর্বল মুহূর্তে সে যেন আবার নিজেকে ধরা না দিয়া ফেলে, নিঃসঙ্গতার দারুণ অভিশাপ সহ্য করিতে না পারিয়া কোনো দিন আবার যেন সে ইহাদের জীবনের সঙ্গে নিজেকে না জড়ায় ইহার জন্যই সে ছিল সাবধান। তাহার জীবন শূন্য হইয়া গিয়াছে। তা যাক। তাহার জীবনের ক্ষতিপূরণ সে আর কাহারও দ্বারা করাইবে না। নিজের জীবনের অভিশাপ সে একাই বহন করিবে। সেই জন্যই সে চিঠি দেয় নাই; ঠিক করিয়াছিল, নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া আর সে কোনো প্রকার সংযোগ রাখিবে না। এতদিনের গাঢ় অন্তরঙ্গতার পর তাহা একটু দৃষ্টিকটু হয় হোক। তাহাতে যদি সকলে একটু পীড়া অনুভব করে, তাহা হইলেও ক্ষতি নাই! ভাবী কল্যাণের জন্য এটুকু আঘাত দিতেই হইবে। কিছুদিন বাদে এ আঘাতও হয়তো আর লাগিবে না। এই পরিবারটির মধ্যে বাহির হইতে সে ভাসিয়া আসিয়াছিল আবার সে ভাসিয়া যাইবে। কোনো দাগ কোথাও হয়তো আর থাকিবে না।

এ-চিন্তা অবশ্য সুখকর নয়। তাহার সমস্ত অন্তরকে ইহা মরুবাত্যায় দগ্ধ করিয়া যায়, তাহার জীবনের সমস্ত অস্ফুট আশা ও কামনাকে দেয় নির্মূল করিয়া। চারিদিকে তাহার অন্তহীন মরু-বিস্তার, সেখানে কোনো দিন কোনো শ্যামলতার সম্ভাবনা আর নাই। তবু নিষ্ফল প্রতিবাদ সে করিবে না! এই জীবনকেই তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে অম্লান মুখে। এই সঙ্কল্পেই প্রদ্যোত অটল ছিল, এমন সময়ে অদ্ভুত একটি ঘটনা

ঘটিয়া গেল। ঘটনা সামান্যই, কিন্তু তাহাতেই প্রদ্যোতের মরু-ধূসর জগৎও আলোড়িত হইয়া উঠিল।

প্রদ্যোত আজকাল মেসের ঘরে কাজ-কর্মের অবসরেও থাকিতে পারে না। অসহ্য মনে হয় ঘরের বন্ধন, অসহ্য মনে হয় মানুষের সঙ্গ। তাহাদের সাধারণ নিত্যনৈমিত্তিক কথাবার্তায় সে যেন হাঁফাইয়া ওঠে। শুধু তাই নয়—সে-সমস্ত কথাবার্তা তাহাকে কোথায় যেন নিষ্ঠুরভাবে সূক্ষ্ম সূচি-মুখে বিদ্ধ করে। যে নির্বিকার নির্লিপ্ততাকে অনেক কষ্টে আয়ত্ত করিতে হয়, তাহা এই তুচ্ছ কথার আঘাতে একেবারে ভাঙিয়া চুরমার হইয়া যায়।

তাহাদের অবশ্য দোষ নাই। তাহারা সাধারণ স্বাভাবিক মানুষ। সংসার জীবনের মধ্যে মগ্ন হইয়া আছে। প্রদ্যোতকে সহজ ভাবেই তাহারা হয়তো জিজ্ঞাসা করে—"কি মশাই! এবারেও বাড়ি যাবেন না নাকি! ঝগড়া-টগড়া করে আসেননি তো! দুটো রবিবার কামাই!"

প্রদ্যোতকে একটু হাসিয়া উত্তর দিতেই হয়—"না, বড় মুশকিল হয়েছে। পরীক্ষার সময়, ছেলেদের রবিবারও পড়াতে হচ্ছে। কখন যাই বলুন।" তাহার পাশেই যে-ভদ্রলোকটির সিট তিনি সহানুভূতি দেখাইয়া বলেন—"এ তো জুলুম মন্দ নয় মশাই। ছাত্রের পরীক্ষা বলে রবিবারও পড়াতে হবে! মাস্টার আর মানুষ নয় যেন। আমি হলে রবিবারে মশাই এমন পড়ান পড়িয়ে দিতাম, যে ছেলে হপ্তার পড়া যেত ভুলে!"

প্রদ্যোত একটু হাসিয়া সে-প্রসঙ্গ এড়াইয়া যায়। তাহার পর এক সময়ে বাহির হইয়া পড়ে। আজকাল সে এমনি করিয়াই বাহিরেই অনেকক্ষণ কাটায়। এমনি করিয়া নিজের কাছ হইতে যেন পলায়ন করিতে চেষ্টা

করে। রাস্তায়-রাস্তায় সে অকারণে বহুক্ষণ পর্যন্ত ঘুরিয়া বেড়ায়। অনেক রাত্রে ক্লান্ত হইয়া বাড়ি ফেরে। কাহারও সঙ্গে দেখা যেন তাহার না হয়, নিজের অশান্ত মনের সঙ্গেও নয়।

এমনি পথে-পথেই সে সেদিন ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। আকাশের আলো ম্লান হইয়াছে, নগরের আলো উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে পারে নাই, কেমন একটা ক্লান্তিতে সমস্ত নগর যেন আচ্ছন্ন। হঠাৎ একটা লোকের সঙ্গে তাহার ধাক্কা লাগিয়া গেল। লোকটা একটু অপ্রসন্নমুখেই ফিরিয়া তাকাইয়াছিল ; কিন্তু পর মুহূর্তেই তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। খপ করিয়া প্রদ্যোতের হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া উত্তেজিতভাবে সে বলিল—"বাঃ, বেশ লোক দাদা তুমি!"

প্রদ্যোত তখনও বিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। লোকটি সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাহার জগতে ইহার স্থান কোথাও নাই।

লোকটা নিজে হইতেই আবার বলিল—"কতদিন এসেছ শুনি! এসে একবার দেখাও করনি! এমনিই হয় বটে। কাজ ফুরলেই সব শেষ।"

প্রদ্যোত তবুও কোনো উত্তর দিতে পারিল না। কী উত্তর সে দিবে! এতক্ষণে ঘটনাটির ভয়ঙ্কর অর্থ তাহার কাছে অবশ্য প্রতিভাত হইয়াছে। সে বুঝিয়াছে এতদিনে অকস্মাৎ তাহার অতীত বিস্মৃত জীবন হইতে আসিয়াছে একটুখানি করাঘাত। কিন্তু তবু যবনিকা উঠিল না। প্রদ্যোত তাহার মনে কোথাও এ-লোকটির পরিচয় খুঁজিয়া পাইল না। কোন সূত্রে ইহার সহিত তাহার আলাপ, অতীত জীবনে কী সম্বন্ধ তাহার সহিত ছিল কিছুই সে জানে না। নীরব থাকা ছাড়া তাহার আর উপায় কি!

লোকটি বলিয়াই চলিল—"এক মাঘে শীত যায় না দাদা, আবার কিন্তু

দরকার হবে! তা এখন উঠেছে কোথায়? আচ্ছা থাক দরকার নেই। ওসব খপর তোমার কাছে চাওয়াই ভুল। কিন্তু একদিন দেখা করবে তো? তোমারও লাভ বই লোকশান নেই। হ্যাঁ, আসল কথা বলি আগে, আমি এখন সে-আস্তানা বদলেছি। ওইতো আমার দোকান। হ্যাঁ, একটা দোকানই খুলে বসেছি দাদা, বাইরের একটা ভড়ং চাই। দোকানে লোহালক্কড়ের সব জিনিস পাবে।"

একবার চোখ টিপিয়া একটু ইশারা করিয়া লোকটা আবার বলিল—"লোহালক্কড়ের দরকার থাকে তো ভুলো না যেন! কেমন আসবে তো?"

"আসব।" বলিয়া কোনো রকমে প্রদ্যোত তাহার হাত এড়াইয়া এবার অগ্রসর হইয়া গেল। তাহাকে এড়াইয়া যাইবার এত ব্যস্ততা তাহার কেন সে নিজেই জানে না। এতদিনে বিস্মৃত-জীবনের সঙ্গে বর্তমানের একটিমাত্র সেতু সে খুঁজিয়া পাইয়াছে, সামান্য একটু সূত্র, যাহা ধরিয়া হয়তো সে আবার লুপ্ত জগৎকে আবিষ্কার করিতে পারে। সেই সূত্রকেই সে অবহেলা করিতে চায়! কেন? এ-সূত্রকে অনুসরণ করার ব্যাকুলতা দূরে থাক—তাহার অস্তিত্বই তাহাকে কেন এমন বিচলিত শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে! প্রদ্যোত নিজের মনে স্পষ্ট কোনো উত্তর পায় না। কিন্তু ভয় যে তাহার হইয়াছে, এ-কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিস্মৃতির যবনিকার পারে কী আছে সে জানে না; কিন্তু আর যেন একটু উঁকি মারার সাহস পর্যন্ত তাহার নাই, ইচ্ছাও নয়। তাহার অবচেতন মন হইতে কোনো সতর্কবাণী যেন তাহাকে আড়ষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। যবনিকার এপারে কোনো আকর্ষণ তাহার আর নাই, নাই কোনো শান্তি—এপারে শুধু মরু-ধূসর শূন্যতা; কিন্তু তবু

ওপারে সে যাইতে চায় না। মনের গূঢ় কোনো দুর্বোধ প্রেরণাই তাহাকে বাধা দিতেছে।

লোকটার কথা সে ভুলিতে চেষ্টা করে। যেটুকু সে দেখিয়াছে, যেটুকু পরিচয় সে পাইয়াছে, তাহাতে সানন্দে স্মরণ করিয়া রাখিবার মতো ব্যক্তি সে নয়। এরকম লোকের সহিত কেন তাহার পরিচয় ছিল, তাহাই সে বুঝিতে পারে না। শুধু পরিচয়ও নয়, বিশেষ ভাবে তাহাদের যে যোগ ছিল, এ-কথাও লোকটির কথায় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কেমন করিয়া তাহা সম্ভব? শুধু বাহিরের চেহারা দিয়া হয়তো মানুষকে বিচার করা উচিত নয়; কিন্তু তবু লোকটির সংস্পর্শে মন যে আপনা হইতে সঙ্কুচিত হইয়া আসে এ-কথা তো আর মিথ্যা নয়। তাহার মুখ ও চেহারার ভঙ্গীতে, কোথায় কোন অন্ধকার-পঙ্কিল জীবনের ছায়া যেন আছে। সাধারণ মানুষের মতো সহজভাবে সে যে জীবন-যাপন করে না, এ-সন্দেহ তাহাকে দেখিলেই বুঝি মন হইতে দূর করা যায় না। যেখানে জীবনের রৌদ্রোজ্জ্বল পথ কুটিলভাবে সুড়ঙ্গের অন্ধকারে নামিয়া গিয়াছে, যেখানে সমস্ত সত্য বিকৃত, সমস্ত স্বাভাবিক আশা আনন্দের অভাব, সেই অন্ধকার-জগতের ছায়া লোকটির সর্বাঙ্গে। এরকম লোকের সহিত তাহার জীবন জড়াইয়া যাওয়া একটু বিস্ময়কর বৈকি। কিন্তু যেমন করিয়াই জড়াইয়া যাক, সে কথা বুঝি বিস্মৃত হওয়াই ভালো!

ভুলিতে চেষ্টা করিলেই কিন্তু ভোলা যায় না। প্রদ্যোতের সমস্ত মনের উপর গাঢ় ছায়া ফেলিয়া এই ঘটনাটুকু জাগিয়া থাকে। কিছুতেই তাহার শান্তি নাই, কিছুতেই ইহাকে অবহেলা করিবার উপায় নাই। প্রতি মুহূর্তে সে ঘটনা যেন তাহাকে ভয়ঙ্কর রহস্যময় ইঙ্গিত

করিতে থাকে। মনের রুদ্ধ প্রকোষ্ঠে কোথায় যেন আছে অন্ধকার গুপ্তদ্বার। এখনই তাহা খুলিয়া যাইতে পারে, দেখা দিতে পারে আবরণ-মুক্ত লুপ্তজীবন। কিন্তু প্রদ্যোতের যেন তাহাতেই ভয়। অর্থহীন গভীর ভয়। একদিন সে যবনিকার এপারে দাঁড়াইয়া হতাশভাবে তাহা অপসারিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, আজ যেন সে প্রাণপণে সেই যবনিকা টানিয়া রাখিতে চায়, দুই জীবনের মাঝে যে-সেতু অকস্মাৎ দেখা দিয়াছে কোনোমতে তাহাকে চায় ভুলিয়া থাকিতে; ভুলিতে না পারিয়াই তাহার অশান্তির সীমা নাই।

প্রদ্যোতের মনের ভিতর তাই চলিয়াছে ভয়ঙ্কর আলোড়ন। আকাশের উপর ঘন মেঘের গভীর আবরণ ছিল প্রসারিত। সেই মেঘ-লোকই যেন অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। সেখানে শুরু হইয়াছে সংঘর্ষ আর চঞ্চলতা। এ বুঝি অপসারণের পূর্ব সূচনা।

প্রতি মুহূর্তে প্রদ্যোত উদ্বিগ্ন হইয়া থাকে। কোন দিক দিয়া কখন যে দ্বার খুলিয়া যাইবে, কে জানে। কে জানে, বিলুপ্ত জীবনের কোন সূত্র হঠাৎ কোথা হইতে বাহির হইয়া পড়িবে।

সম্ভবত, এই উদ্বেগের জন্য রাত্রে সে কয়েকদিন অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখিতেছে। হয়তো এ সমস্ত অর্থহীন স্বপ্নমাত্র। হয়তো এগুলি তাহার গত জীবনের ছিন্ন নানা অংশ, মনের গভীর অন্ধকার কক্ষ হইতে অকস্মাৎ খেয়ালী হাওয়ায় ভাসিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এসব স্বপ্ন প্রদ্যোতকে আরও শঙ্কিত করিয়াই তোলে। নিজের যে পরিচয় সে অধিকাংশ সময়ে এই স্বপ্নের মধ্যে পায়, সত্য হইলে তাহা প্রীতিকর কোনো দিক দিয়াই নয়।

ক্রমশ এই দ্বন্দ্বও তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল। নিজের উপর এমন

বিনিদ্র ভাবে পাহারা আর বুঝি দেওয়া যায় না। সারাদিন এমন আতঙ্ক ও অস্বস্তির মধ্যে জীবন যাপন করার চেয়ে দুঃখের বুঝি আর কিছু নাই। তাহার চেয়ে এ-অশান্তি বুঝি একেবারে শেষ করিয়া দেওয়াই ভালো। নিজেকে পুনরাবিষ্কার করিবার আঘাত যত বড়ই হোক, এই অনিশ্চয়তার অশান্তি হইতে সে তো মুক্তি পাইবে। এখন প্রতি মুহূর্তে একটি ঘটনা তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছে। কেবলই তাহার মনে পড়িতেছে, এই শহরের ভিতর একটি লোক তাহার বিলুপ্ত অতীতের সূত্র লইয়া অপেক্ষা করিয়া আছে। যে কোনো সময়ে তাহার সহিত আবার দেখা হইয়া যাইতে পারে। আর তাহাকে বাহিরে এড়ানো হয়তো সম্ভব; কিন্তু ভিতরে তাহার ভয়ঙ্কর ইঙ্গিত কিছুতেই যে উপেক্ষা করিয়া থাকা যায় না। প্রদ্যোত শেষ পর্যন্ত ঠিক করিল, সে যাইবে। যবনিকা তুলিয়া উঠিয়াছে। একবার অপসারিত হইলে কী যে সে দেখিবে তাহা সে জানে না; হয়তো তাহা নিজের অপ্রত্যাশিত ভয়ঙ্কর এক রূপ, হয়তো আর কিছু, কিন্তু তাহা না জানিয়াও তাহার আর শান্তি নাই। এই মরু-ধূসর জগতেও এই অস্বস্তি লইয়া সে আর যেন বাস করিতে পারিতেছে না।

লোকটি তাহার দোকানের অবস্থান জানাইয়া দিয়াছিল। একদিন বিকালে প্রদ্যোত সেখানে গিয়া হাজির হইল। পথে আসিতে-আসিতে সমস্ত কথা সে ভাবিয়া রাখিয়াছে। ধরা দিলে তাহার চলিবে না। অতীত যে তাহার স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এ-কথা সে জানাইতে চাহে না। তাহাকে ধরা না দিয়াই নিজের পরিচয় জানিয়া লইতে হইবে। অপরের কথা হইতে সমস্ত ইঙ্গিত সংগ্রহ করিয়া নিজের বিস্মৃত জীবনী খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। কিন্তু সৌভাগ্য

বা দুর্ভাগ্যবশত দেখা তাহার হইল না। দোকানের কাছে গিয়া প্রদ্যোতের মনে পড়িল লোকটির নাম সে জানে না। নাম জানিবার সুবিধা সেদিন হয় নাই। দোকানের ভিতর সামান্য কিছু কিনিবার ছুতায় সে প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু লোকটিকে সেখানে না দেখিতে পাইয়া সে যেন আশ্বস্ত হইল। নিজের মনকে শান্ত করিবার জন্য তবু আরো কিছু প্রয়োজন ছিল। প্রদ্যোত অনিচ্ছা সত্ত্বেও জিজ্ঞাসা করিল—"এ দোকানের মালিকের সঙ্গে একটু দরকার ছিল! কখন পাওয়া যাবে বলতে পারেন?"

ছোট একটি তক্তাপোষের উপর সামনে একটি কাঠের বাক্স লইয়া স্থূলকায় একটি ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। তিনি ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"মালিকের সঙ্গে কী দরকার! আপনার কী চাই বলুন না।"

প্রদ্যোত একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—"আমার মালিকের সঙ্গেই দরকার!"

"আমিই মালিক!" বলিয়া লোকটা এবার অত্যন্ত সন্দিগ্ধভাবে প্রদ্যোতকে যেন আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করিয়া লইল।

সে-দৃষ্টিতে প্রদ্যোতের অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইবারই কথা। কিন্তু অকস্মাৎ তাহার মন কি কারণে তখন যেন অত্যন্ত হাল্‌কা হইয়া গিয়াছে। এ-দৃষ্টি সে লক্ষ্যই করিল না। দোকানের মালিককে বিমূঢ় করিয়া দিয়া সে একবার শুধু সবিস্ময়ে বলিল—"আপনিই মালিক!" তাহার পর অসঙ্কোচে সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিল।

বাহিরে আসিয়া তাহার মনে হইল, হঠাৎ যেন তাহার মনের দুঃসহ গুমোট কাটিয়া গিয়াছে। সে মুক্ত। অতীতের ভয়ঙ্কর ছায়া তাহার প্রত্যেক মুহূর্তকে অনুসরণ করিতেছে ভাবিয়া এতদিন বুঝি বৃথাই সে

ভয় পাইয়াছে। সত্যই, সামান্য একটা রাস্তার লোকের কথা হইতে এতখানি কল্পনা করিয়া লইবার তাহার কি কারণ ছিল। রাস্তার কত লোককে ভুল করিয়া তো পরিচিত বলিয়া মনে হয়। লোকটারও যে ভুল হয় নাই, তাহা কে বলিতে পারে। লোকটা মিথ্যা ঠিকানা দিয়া নিজের বিরুদ্ধে অবিশ্বস্ততার প্রমাণ তো নিজেই রাখিয়া গিয়াছে। হয়তো লোকটার সহিত তাহার জীবনের কোনো যোগ কোথাও নাই। তাহার অতীত জীবনের ধারা পৃথক। হয়তো তাহার অতীত জীবন সত্যই সমস্ত চিহ্ন লইয়া একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আর কোনোদিন তাহার ছিন্ন সূত্র বর্তমানের ভিতর দেখা দিয়া বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিবে না।

এই কয়দিনের দুশ্চিন্তার পাষাণ-ভার হইতে মুক্ত হইয়া প্রদ্যোত আজ প্রথম অনেকদিন বাদে সন্ধ্যা হইতেই মেসে ফিরিয়া গেল। কিন্তু সেখানেও তাহার জন্য আর এক বিস্ময় যে অপেক্ষা করিয়া আছে, কে জানিত। সিঁড়ি দিয়া নিজের ঘরে উঠিতে-উঠিতে সে উপর হইতে উল্লসিত সাগ্রহ চিৎকার শুনিল—"রাঙাদা!"

আশ্চর্য ব্যাপার! বিমল সেই সুদূর দারবাক হইতে একলা খোঁজ করিয়া এই মেসে আসিয়াছে রাঙাদার জন্য! আশ্চর্য হইয়াছে সব চেয়ে বেশি বিমল নিজে। এ কল্পনাতীত কীর্তি তাই উচ্চৈঃস্বরে সমস্ত পৃথিবীতে রাষ্ট্র করিয়া দেওয়া তাহার পক্ষে অন্যায় নয়।

প্রদ্যোতের সিঁড়িটুকু উঠিবার অপেক্ষা না রাখিয়া বিমল তাড়াতাড়ি নামিয়া মাঝ-পথেই তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। তাহার পরই শুরু হইল

তাহার ভ্রমণ-কাহিনী। কিন্তু শুধু ভ্রমণ-কাহিনী সে নয়, এতদিনে রাঙাদার অভাবে অনেক কথা তাহার মনে জমা হইয়া আছে। বাড়ি হইতে আরও অনেক কথা রাঙাদাকে জানাইবার ভার লইয়া সে আসিয়াছে। এই সমস্ত কথাই একসঙ্গে জড়াইয়া গিয়া ভ্রমণ-কাহিনীকে একটু জটিল ও বিচিত্র করিয়া তুলিল।

প্রদ্যোত 'প্রথম বিস্ময়ের ধাক্কা সামলাইবার পূর্বেই অনেক কিছু বিমল বলিয়া ফেলিয়াছে। পৃথিবীতে সময়ের অভাব সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান প্রখর। সে জানে, অনেক কথাই অবসরের অভাবে শেষ পর্যন্ত অকথিত থাকিয়া যায়। সময়ের অপব্যয় সে অন্তত করিবে না।

সিঁড়িটুকু পার হইয়া ঘরে পৌঁছাইবার পূর্বেই এক নিশ্বাসে সে যাহা বলিয়াছে, বিষয় হিসাবে ভাগ করিয়া সাজাইলে তাহার ভিতর অনেকগুলি তথ্য পাওয়া যায়। তথ্যগুলি অসংলগ্ন। কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়!

বিমল ইতিমধ্যে জানাইয়াছে, যে ট্রেন-গাড়িতে চড়িয়া কলিকাতা আসিতে সে বিন্দুমাত্র ভয় পায় নাই। কলিকাতা এত বড় শহর, তাহা অবশ্য তাহার জানা ছিল না। কিন্তু ইহাতে ভয় পাইবার কি আছে। এই তো সে অনায়াসে রাঙাদার মেস খুঁজিয়া বাহির করিল। বড়দিদি ও মা'র কেন যে তাহার শক্তিতে বিশ্বাস নাই, সে বুঝিতে পারে না। আর রাঙাদা কেন এতদিন দেশে যায় নাই তার কৈফিয়ৎ অবিলম্বে চাই। সেই জন্যই তাহার আসা। আর কমল এখন ভয়ানক আবদারে হইয়াছে। আসিবার জন্য তাহার কি কান্না। সে যে ছেলেমানুষ, এ-কথা সে কিছুতেই বুঝিতে চায় না। এত বড় শহরে সে কি পথ খুঁজিয়া আসিতে পারিত? তাহাকে সঙ্গে আনিলে বিমলকেই পদে-পদে বিপদ্‌গ্রস্ত

হইতে হইত। আর কলিকাতায় বিমল যখন আসিয়াছে, তখন সে যাদুঘর ও চিড়িয়াখানা না দেখিয়া যাইবে না।

বিমল দম লইবার জন্য একটু বুঝি তাহার পর থামিয়াছিল। প্রদ্যোত সেই সুযোগে জিজ্ঞাসা করিল—"তোকে যে একলা পাঠিয়ে দিলে! তুই লুকিয়ে পালিয়ে আসিসনি তো!"

বিমল উত্তেজিত হইয়া বলিল—"বা রে লুকিয়ে পালিয়ে আসব কেন? লুকিয়ে এলে, পয়সা পাব কোথায়? মা তো পয়সা দিয়ে দিলে। ট্রামের পয়সা কিন্তু বেঁচে গেছে, জানো রাঙাদা। স্টেশনে একজন লোককে তোমার ঠিকানা দেখিয়ে কোন ট্রামে যাব জিজ্ঞাসা করেছিলাম কিনা! আমি নিজেও আসতে পারতাম কিন্তু। ট্রামে চড়া আবার কি শক্ত! তিনিই পয়সা দিয়ে দিলেন রাঙাদা। আমি দিতে যাচ্ছিলাম, কিছুতে নিলেন না! তিনি এই দিকেই আসছিলেন কিনা। তাই ট্রামে তাঁর সঙ্গেই উঠেছিলাম। ট্রাম থেকে নেমে কিন্তু আমি একলা এ-বাড়ি খুঁজে বার করেছি—বার করা তো ভারি শক্ত! উমেশ ভট্টাচার্য লেন তো লেখাই আছে রাস্তার গায়ে।"

বিমলের অসংলগ্ন উচ্ছ্বাস বহিয়াই চলিল। প্রদ্যোতের সমস্ত মন তখন কিন্তু অনুশোচনায় ভরিয়া গিয়াছে। কত দুঃখে, কী হতাশায়, নিরুপায় হইয়া মা যে শেষ পর্যন্ত এই ছেলেটিকে তাহার খোঁজে কলিকাতার সমস্ত বিপদের মধ্যে পাঠাইয়াছেন, তাহা বোঝা তাহার পক্ষে কঠিন নয়। তাহার মনে পড়িল, এই কয়দিন মা'র চিঠির একটা উত্তর পর্যন্ত সে দিতে পারে নাই। বিমল নিরাপদে যে পৌঁছিয়াছে তাহা সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু কোনো বিপদ ঘটিলে কেমন করিয়া সে নিজেকে ক্ষমা করিত!

এবার বিমল তাহার উচ্ছ্বাসের মাঝে হঠাৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল—"তোমার অসুখ করেছিল, না রাঙাদা ?"

তাহার পর উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়াই বলিয়া চলিল—"বড়দি তাই বলছিল। বলছিল খুব হয়তো ভারি অসুখ করেছে সেখানে। অসুখ না হলে সে কখনো এতদিন একটা চিঠি দিয়েও খোঁজ নেয় না! আমিও তাই ভাবছিলুম। কাল কিন্তু বাড়ি যেতে হবে, রাঙাদা। কাল বিকেলে অবশ্য। সকালবেলাই চিড়িয়াখানা খোলা থাকে তো!"

প্রদ্যোত হাসিয়া বলিল—"থাকে! কিন্তু কাল তো বাড়ি যাওয়া হবে না বিমল!"

বিমলের মনের ইচ্ছা হয়তো তাই। এত কষ্ট করিয়া কলিকাতা আসিয়া একদিন মাত্র থাকিয়াই সে চলিয়া যাইতে চাহে না। কিন্তু তাহার দায়িত্ব সে ভুলিবে কেমন করিয়া! বিষণ্ণ মুখে সে বলিল—"কালই যে যেতে বলে দিয়েছে, রাঙাদা। মা সে জন্যেই তো আমায় পাঠিয়ে দিলে। সেখানে কি সব গোলমাল হয়েছে কিনা!" প্রদ্যোত উদ্বিগ্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কী গোলমাল ?"

"কি জানি কী সব! ছোড়দির নাকি আর বিয়ে হবে না, তাই কী সব নিন্দে হয়েছে। ওঃ, তোমায় যে একটা চিঠি দিয়েছে। ভুলেই গেছি দিতে!" কি ভাগ্য, যে চিঠিটুকু হারায় নাই। বিমল তাহার জামার পকেট খুঁজিয়া চিঠিটুকু এবার বাহির করিল।

ছোট চিঠি নয়, বেশ দীর্ঘ। অনেক কথাই মাকে লিখিতে হইয়াছে। না লিখিয়া বুঝি উপায় ছিল না।

চিঠি পড়িতে-পড়িতে প্রদ্যোতের মুখ ক্রমশ অন্ধকার হইয়া আসিল। তাহার অনুপস্থিতিতেই মা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন সে ভাবিয়াছিল,

দেখাশোনার অভাবে হয়তো সেখানে ভয়ানক অসুবিধা হইতেছে—সেই জন্যই এবং প্রদ্যোতের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হইয়া মা শেষ পর্যন্ত বিমলকে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছেন। সেখানে যে এত রকমের জটিলতা সৃষ্টি হইয়াছে তাহা সে কল্পনাও করে নাই। এই পরিবারটির বর্তমান সমস্ত দুঃখের সে-ই যে এক হিসাবে মূল, ইহা বুঝিয়া তাহার সমস্ত আরও বিস্বাদ লাগে। সে ইহাদের জীবনে অশান্তিই ডাকিয়া আনিয়াছে। নিজের জীবনের অভিশাপ সে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছে এই পরিবারটির উপর। নিজেকে অপসারিত করিয়াও লাভ হয় নাই। ফল বিপরীতই হইয়াছে।

মাকে অনেক দুঃখে সমস্ত সংকোচ ত্যাগ করিয়া সব কথা লিখিতে হইয়াছে। গ্রামে এই পরিবারটির বাস করাই দায় হইয়া উঠিয়াছে। নির্মলার বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখান করা হইতেই বোধ হয় এই গোলমালের সূত্রপাত। অনুগ্রহ করিয়া প্রায় বিনা পণে যাহারা কন্যা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিল, তাহারা এই প্রত্যাখানকে অপমান হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছে এবং এ-অপমানের প্রতিশোধ নিষ্ঠুর ভাবে দিতে বিলম্ব করে নাই। সৎপাত্র পাওয়া সত্ত্বেও নির্মলার বিবাহ দিতে নারাজ হইবার কারণ অত্যন্ত কুৎসিতভাবে উদ্ভাবন করিয়া তাহারা সর্বত্র প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে। যথারীতি পল্লবিত হইয়া কথাটা ইতিমধ্যেই এমন ভাবে রাষ্ট্র হইয়াছে, যে বাহিরে তাঁহাদের মুখ দেখাইবার উপায় নাই। লোকে বাড়িতে আসিয়া পর্যন্ত অপমান করিয়া যাইতে আর দ্বিধা করে না। প্রদ্যোতের সুদীর্ঘ অনুপস্থিতি তাহাদের কল্পনার আরও খোরাক জুটাইয়াছে। প্রদ্যোত এ-পরিবারের আপনার জন না হইয়াও যে ইহাদের ভরণ-পোষণ করিতেছে, ইহাই তাহাদের কুৎসিত

আলোচনার বিষয়। এইখানেই তাহাদের কল্পনার ক্ষেত্র। প্রদ্যোতের অনুপস্থিতিরও তাহারা এমন সব ব্যাখ্যা বাহির করিয়াছে যাহা কানে শোনা যায় না। অথচ না শুনিলেও উপায় নাই। যাহারা এ-সব কথা উদ্ভাবন করে, না শুনাইয়া তাহাদের স্বস্তি নাই। নিজের গরজেই তাহারা গায়ে পড়িয়া সব কথা বলিয়া যায়।

মা শেষ পর্যন্ত লিখিয়াছেন যে, পাড়ায় যেভাবে কুৎসা রটিয়াছে তাহাতে নির্মলার বিবাহ হওয়াই বুঝি অসম্ভব। সকলেই তাঁহাদের বিপক্ষে। তাঁহারা অসহায় বলিয়াই তাঁহাদের পক্ষ লইবার জন্য কাহারও আগ্রহ নাই—এই বিপদের সময় কী অপরাধে প্রদ্যোতও তাঁহাদের পরিত্যাগ করিয়াছে, তিনি ভাবিয়া পাইতেছেন না। প্রদ্যোতের কাছে শেষ একটি অনুরোধ তিনি করিয়াছেন। প্রদ্যোত আর কিছু না করুক, এই অনুরোধটি যেন সে রাখে। একদিন তিনি দেশের বাড়িঘর বেচিয়া অন্য কোথাও চলিয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন। প্রদ্যোত তখন বাধা দিয়াছিল। কিন্তু এখন আর উপায় নাই। তাঁহার নিজের বাপের বাড়ির গ্রামে সামান্য টাকাকড়ি যাহা পাওয়া যাইবে তাহা লইয়া কোনো রকমে হয়তো তাঁহার আশ্রয় মিলিতে পারে। এ-গ্রামে বাস করা যখন কোনো দিক দিয়াই আর সুবিধা নয়, তখন প্রদ্যোত যেন এইটুকু ব্যবস্থা তাঁহাদের করিয়া দেয়। দারবাকের জমি-জমা সামান্য যাহা আছে তাহার ন্যায্য মূল্যটুকু হইতে যাহাতে তাঁহারা বঞ্চিত না হন, এটুকু যেন প্রদ্যোত দেখে। তাহার বিরুদ্ধে তাঁহার সত্যই কোনো ক্ষোভ নাই। সে যাহা করিয়াছে, নিজের সন্তানও তাহা বড় একটা করে না। প্রদ্যোতকে সেজন্য তিনি আশীর্বাদ করিতেছেন।

প্রদ্যোত চিঠি হাতে লইয়া অনেকক্ষণ গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল।

অমলবাবুদের পরিবারের উপর হইতে দুর্যোগের মেঘ কোনো দিনই দূর হয় নাই। তাহার নিজের চেষ্টাও সেদিক দিয়া নিষ্ফল হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের এই পরিণাম সে যেন সহ্য করিতে পারে না। এত দূর সে কল্পনা করে নাই। সব চেয়ে দুঃখের কথা এই, যে এ-পরিণামের জন্য সে নিজেই বেশির ভাগ দায়ী ; কিন্তু কী এখন সে করিতে পারে!

হ্যাঁ, পারে বৈকি! সমস্ত দুর্ঘটনা দুর্যোগের ভিতর দিয়া ভাগ্যদেবতার নির্দেশ এবার সে অসংকোচে গ্রহণ করিতে পারে। ভয় করিবার, দ্বিধা করিবার আর তাহার কিছু নাই। নিয়তির নির্দেশ যেখানে তাহার অন্তরের নির্দেশের সহিত মিলিয়াছে সেখানে সে সংকোচ করিবে কেন? সমাজ, সংস্কার—সব কিছুর সম্মান রাখিয়া সে নিজেকে বঞ্চিত করিতে চাহিয়াছিল। নিজের সত্যকে অস্বীকার করিয়া স্বেচ্ছা-নির্বাসনের সমস্ত বেদনা বরণ করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু এ-আত্মনিগ্রহের কোনো অর্থ-ই তো আর হয় না। কাহাকে সে সম্মান করিবে! সমাজ মানে তো এই! অসহায় এক নিরীহ পরিবারের বিরুদ্ধে জঘন্যতম ষড়যন্ত্র করিতে তাহার বাধে না। এই সমাজের মুখ চাহিয়া নিজের জীবনের সত্যকে কেন সে বলি দিবে? বলি দিয়া কল্যাণ হইবে কার? নির্মলার নয়, তাহারও নয়। বিলুপ্ত জীবনে কি যে তাহার পরিচয় সে অবশ্য জানে না! কিন্তু না জানিলেই বা কী আসে যায়। সে-জীবনের সহিত কোনো সম্বন্ধও তাহার নাই। তাহার তো নবজন্ম হইয়াছে। সত্য তাহার বর্তমান। এই বর্তমান জীবনে সে কিছুর অযোগ্য নয়। বর্তমান জীবনেরও দাবি তো আছে! সুখের দাবি, শান্তির দাবি, নূতন করিয়া ভবিষ্যৎ রচনার দাবি। সে-দাবিও তাহাকে মিটাইতে হইবে। যে অতীত মৃত্যু-গাঢ় অন্ধকারে হারাইয়া গিয়াছে, তাহারই ভয়ে সংকুচিত

হইয়া বসিয়া থাকিবার তাহার কোনো প্রয়োজন নাই। এবার আর সে ভয় করিবে না, নিজের জীবনের সত্যকে নির্ভীকভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবে। অন্তরের নির্দেশ যখন ভাগ্যদেবতার নির্দেশের সহিত মিলিয়াছে তখন দ্বিধাভরে সে দাঁড়াইয়া থাকিবে না।

নির্মলার দিক হইতে যে বাধার কথা আগে তাহার ভাবার প্রয়োজন ছিল, সে-বাধাও তো এখন দূর হইয়া গিয়াছে। নির্মলার নামে, তাহার পরিবারের নামে প্বাছে কুৎসা রটে, এই জন্যই সে ভয় পাইয়াছিল; কিন্তু আর ভয় করিবার কিছু নাই। সমাজ নিজে হইতেই তাহাদের নামে কালি-লেপনের ভার লইয়াছে, ঘটনার জন্য অপেক্ষা করে নাই। নির্মলাকে গ্রহণ করিলে, তাহাদের পরিবারের সামাজিক অখ্যাতি আর বেশি কিছু হইবে না। তাহাদের নামে যথেষ্ট কুৎসা রটনা হইয়াছে তাহার পূর্বেই—বুঝি ভালোই হইয়াছে। অবস্থা সকল দিক দিয়া এমন জটিল না হইয়া উঠিলে, বুঝি প্রদ্যোত নিজের সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রেরণা পাইত না। নিজের স্বার্থ-ই পাছে প্রধান হইয়া ওঠে, এই ভয়েই সে নিজেকে অপসারিত করিয়া রাখিত।

সমস্ত ঘটনার ধারার ভিতর এবার প্রদ্যোত সত্যই যেন ভাগ্য-দেবতার স্পষ্ট নির্দেশ দেখিতে পায়। এই ধারায় যতক্ষণ সে ভাসিয়া আসিয়াছে, ততক্ষণ তাহার মনে বুঝি সংশয়-দ্বিধা-দ্বন্দ্বের শেষ ছিল না। নদীর প্রতি বাঁকে সে ভয় পাইয়াছে, হতাশ হইয়াছে, দুলিয়াছে সন্দেহ-দোলায়। তাহার মনে হইয়াছে, এ ধারা বুঝি অর্থহীন; উদ্দেশ্যহীন ইহার গতির কুটিলতা। তাহাকে লইয়া এ যেন খেয়ালী কোন নিষ্ঠুর দেবতার খেলা! কিন্তু এখন সে যেন লক্ষ্য দেখিতে পাইয়াছে। তাহার সমস্ত ঘটনার ধারার অর্থ এইবার তাহার কাছে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। নানা পথে

ঘুরাইয়া, নানাভাবে নাকাল করিয়া জীবন-বিধাতা তাহাকে এইখানেই পৌঁছাইতে চাহিয়াছেন। এইজন্যই বুঝি তাহার নবজন্মের প্রয়োজন ছিল। সমস্ত আশ্রয় হইতে বিচ্যুত হইয়া, সমস্ত অবলম্বন হারাইয়া এমনি করিয়া নূতনভাবে তাহাকে জীবনের সার্থকতা ও মহিমা আবিষ্কার করিতে হইবে, এই বুঝি তাঁহার অভিপ্রায়!

চিঠি পড়ার পর রাঙাদার মুখ দেখিয়া বিমল ভয় পাইয়াছিল কিনা, কে জানে। এতক্ষণ কিন্তু তাহার কোনো কথা শোনা যায় নাই। এইবার সাহস করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—"কালকেই যাবে তো রাঙাদা।"

প্রদ্যোত হাসিয়া বলিল—"নিশ্চয়ই।"

প্রদ্যোতের মনে আর কোনো দ্বিধা নাই। নিজের পথ সে দেখিতে পাইয়াছে।

তেরো

এ-কাহিনী এখানেই সমাপ্ত হইলে বুঝি ভালো হইত। অতীত জীবনের যবনিকা তুলিয়া দেখিতে প্রদ্যোত আর চায় না; নূতন জীবনে আপনাকে সার্থক করিবার একটুখানি সুযোগ পাইলেই সে সন্তুষ্ট। সে-সুযোগটুকু সে লাভ করুক, এই বুঝি আমাদের কামনা। কঠিন সাধনা সে করিয়াছে, মূল্যও বড় কম দেয় নাই। নিজের জীবনকে নিশ্চিন্তভাবে রচনা করিবার অধিকার সত্যই সে অর্জন করিয়াছে।

প্রদ্যোতকে আমরা ছোট একটি সংসারের মধ্যে কল্পনা করিতে পারি। শান্ত অনাড়ম্বর জীবন-যাত্রা—আনন্দ গভীর বলিয়াই বাহিরে কোনো চাঞ্চল্য নাই। তাহারই ভিতর দিয়া সে প্রতি মুহূর্তে জীবনের অসীম রহস্যের স্বাদ আবিষ্কার করিয়া চলিয়াছে। জীবনকে জানিবার জন্য উদ্ভট কোনো সাধনার, অসাধারণ কোনো আয়োজনের প্রয়োজন নাই, এইটুকু এতদিনে সে জানিয়াছে। সে জানে জীবনের সত্যকার মহিমা উচ্ছৃঙ্খল উল্কা-গতিতে নয়, শান্ত সুসঙ্গত ছন্দে। সৃষ্টির গূঢ়তম অর্থ এই ছন্দেই ধরা পড়ে। সেই ছন্দেই প্রদ্যোত তাহার জীবন এবং একটি সংসারকে রচনা করিয়া তুলিতেছে বলিয়া আমরা কল্পনা করিতে পারি।

আমরা মনে করিতে পারি, দারবাকের সেই বাড়িটিতেই সে আছে। যে-পরিবার তাহার নিরাশ্রয় জীবনকে আশ্রয় দিয়াছিল তাহাদের

কাহাকেও সে ছাড়িতে চায় না। সকলকে লইয়াই চলিয়াছে তাহার অপরূপ রচনা। তাহার নির্ভীক আত্ম-প্রতিষ্ঠ আচরণে গ্রামের বিষাক্ত শাণিত জিহ্বাও হার মানিয়া নীরব হইয়াছে। এ-পরিবারের মাথার উপর দুর্যোগের মেঘ আর ঘনাইয়া নাই।

বাহিরের দিক দিয়া তাহার জীবন এখনও হয়তো পরিবর্তিত হয় নাই; এখনও সে সমস্ত হপ্তা কলিকাতায় কাটাইয়া শনিবার সন্ধ্যায় উৎসুকভাবে ট্রেনে আসিয়া চাপে। পুরাতন কবিতার মতো সেই অতি পরিচিত পথ মধুরভাবে ট্রেন যেন পুনরাবৃত্তি করিয়া যায়। স্টেশনে নামিয়া অস্পষ্ট অন্ধকারের ভিতর দিয়া আচ্ছন্নের মতো সে গ্রামের পথ পার হয়। এ সমস্ত গ্রাম এখন যেন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো বিশেষভাবে গোচর না হইয়াই স্নিগ্ধ সান্নিধ্যের স্পর্শ দেয়। তাহার হাতে ছোটখাট একটি মোট। তাহার ভিতর কত কী অপরূপ সামগ্রী যে আছে, কে জানে! হয়তো বড়দির ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু লজেনচুস। কমলের জন্য রঙিন ছবির বই, বিমলের জন্য হয়তো দুর্লভ একটি দোফলা ছুরি, সংসারের জন্য দুষ্প্রাপ্য কিছু আনাজ, আর হয়তো নির্মলার জন্য সামান্য কয়েক গজ জরির ফিতা। দরজায় আঘাত দিতে না দিতে এখনও উৎসুক হাতে খিল খুলিয়া যায়। তাহার পর শুরু হয় আনন্দ-কোলাহল।

দারবাকের সেই বাড়িটিরও কিছু পরিবর্তন হইয়াছে নিশ্চয়। দক্ষিণের ভাঙা ঘরের হয়তো সংস্কার হইয়াছে। তাহার উপর নূতন পাতার ছাউনি। ঘরের ভিতর হইতে আলো দেখা যায়। দুই উৎসুক হাতে এই দিনটির প্রতীক্ষায় নির্মলা সমস্ত সুচারুরূপে নিখুঁতভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছে। ধব্‌ধব্‌ করে পরিপাটি বিছানা। আলনার ধারে কাপড় জামা

পরিচ্ছন্নভাবে ঝোলানো। টেবিলের উপর নূতন মাজা বাতিটি ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে। ঘরের আসবাব হয়তো সামান্যই কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকটিতে নিপুণ একটি হাতের স্পর্শ পরিস্ফুট। বড় আটচালার দাওয়ায় হয়তো আগেকার মতোই জটলা হয়। আধ-অবগুণ্ঠিত একটি মেয়ে শুধু বুঝি দূরে-দূরে থাকে। তবু তাহার সমস্ত দেহ মনের উচ্ছল আনন্দ বুঝি চাপা থাকে না। হয়তো দিদি বলেন—"তোর আজ চা করতে হবে না বাপু। পেয়ালাটা ভাঙলি তো!"

চাপা হাসির সঙ্গে মৃদু কণ্ঠস্বর শোনা যায়—"না গো ভাঙব কেন। পড়ে গেল হাত লেগে!"

"আজ তোর হাত থেকে সব পড়ে যাবে! তুই সর দেখি।" বড়দিকে এ-অন্যায় পরিহাসের জন্য দৃষ্টি দ্বারা শাসন করিয়া রাগের ভান করিয়া নির্মলা চলিয়া যায়; কিন্তু বেশি দূরে কোথাও নয়।

বড়দি আবার ডাকিবামাত্র তাহার সাড়া পান—"নে, চা দিয়ে আয় প্রদ্যোতকে! সেদিনের মতো আবার হাতে ফেলে দিসনি যেন গরম চা।"

"আহা, সেদিন বুঝি আমার দোষ ছিল—নিতে গিয়ে ছেড়ে দিলে কেন!"

তাহার পর রাত আরও বাড়ে। নিস্তব্ধ গ্রামের উপর রাত্রির আকাশ জ্যোতির্লোকের রহস্য-সঙ্কেত প্রসারিত করিয়া দেয়। ঘরে নির্মলা প্রদ্যোতের কাছে ঘেঁষিয়া বসিয়াছে। মাথার ঘোমটা তাহার হয়তো প্রায় সমস্তটাই সরিয়া গিয়াছে, তবু মনে হয়, সে মুখ আধ-অবগুণ্ঠনের অপরূপ রহস্যে যেন মণ্ডিত। সবখানি তাহার জানা যায় না, কোনো দিনই যাইবে না। যত দূরই অভিযান করুক না কেন, তাহার রহস্য যে

কোনোদিন ফুরাইবে না, ইহাতেই বুঝি প্রদ্যোতের গভীর পরিতৃপ্তি নির্মলাই তাহার জীবনে রাত্রির আকাশের রহস্য-সঙ্কেত আনিয়াছে।

কিন্তু এ-কল্পনা এখন থাক।

এ-কাহিনীর সমাপ্তি হইতে আর একটু বাকি আছে।

প্রদ্যোত বিস্মৃতির যবনিকা অপসারিত করিতে আর চায় নাই হয়তো, কিন্তু তবু যবনিকা উঠিল অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে। প্রদ্যোতের সমস্ত কল্পনা, সমস্ত সঙ্কল্প গেল বিপর্যস্ত হইয়া।

পরের দিন সকাল বেলা প্রদ্যোত বিমলকে লইয়া চিড়িয়াখানা দেখাইতেই বুঝি বাহির হইতেছিল। সহসা দরজার কাছেই কাহার ডাকে সে ফিরিয়া তাকাইল।

তাহার নিয়তির এই বুঝি বিধান—অকস্মাৎ তাই সে ফিরিয়া তাকাইল শুধু পিছনে নয়, তাহার বিলুপ্ত সমস্ত অতীত জীবনের উপর।

দেখা গেল, রাস্তার কাছে মেসের দরজার পাশে একটা লোক দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে। প্রদ্যোত তাহাকে সহসা চিনিতে পারিল, রাস্তার ধারে আকস্মিক ভাবে যাহার সহিত দেখা হইয়াছিল সেই লোকটি বলিয়া নয়, চিনিতে পারিল তাহার পূর্বের সমস্ত আবেষ্টন, সমস্ত ইতিহাসের সঙ্গে জড়াইয়া—যবনিকা খসিয়া পড়িল এক মুহূর্তে। একটি লোকের পরিচয় যেন ঘন বিস্মৃতির কুয়াশা অপসারিত করিয়া আসিয়া মনের রুদ্ধ দ্বার সহসা খুলিয়া দিয়াছে।

সেই মুহূর্তে প্রদ্যোতের চোখে সমস্ত জগতের রূপও যেন পরিবর্তিত হইয়া গেল।

লোকটা কুৎসিত মুখে, অশোভন ভাবে হাসিয়া বলিল—"বড্ড চমকে গেছ, কেমন দাদা! দিব্যি গা ঢাকা দিয়ে থাকবার চেষ্টায় ছিলে; কিন্তু মথুর রায়কে ফাঁকি দিতে পারলে না। কেমন খুঁজে বার করেছি তো!"

প্রদ্যোত অনেকক্ষণ নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে অতি কষ্টে যেন উচ্চারণ করিল—"কী দরকার বল?"

"দরকার! দরকার না হলে বুঝি আসতে নেই। পুরনো আলাপীর সঙ্গে দুটো কথা কইতে বুঝি ইচ্ছে হয় না!"

প্রদ্যোতকে তথাপি নীরব দেখিয়া মথুর আবার বলিল—"আমায় দেখে বড় খুশি হয়েছ বলে তো মনে হচ্ছে না। আমাকে আবার ভয় কিসের, দাদা! নতুন কিছু মতলবে আছ বুঝি কিন্তু জানো তো দাদা, আমা হতে কোনো অনিষ্ট হবে না। আমি তো আর বিষ্ণুপদ নই, দরকার হলে কালা বোবা দুই হতে জানি।"

ইহাকে একেবারে উপেক্ষা করা বুঝি চলে না। প্রদ্যোত হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"বেশ, কিন্তু আমায় ভুল ঠিকানা দিয়েছিলে কেন!"

"ভুল নয় দাদা, ঠিকই দিয়েছিলাম। তবে সাবধানের বিনাশ নেই। অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ হয়নি, প্রথম দিনটা তাই একটু ডুব দিলাম। যাই হোক দেখা তো হল।"

প্রদ্যোত যেন একটু কুণ্ঠিত ভাবে বলিল—"আর একদিন এস। আজ আমি একটু ব্যস্ত!"

"তা তো দেখতেই পাচ্ছি। তবু দুটো কথা আমার শুনলে আর কি ক্ষতি হবে!"

এড়াইবার আর কোনো উপায় নাই। বিমলকে একটু অপেক্ষা করিতে

বলিয়া মথুরের সঙ্গে প্রদ্যোতকে যাইতেই হইল। মথুর হাসিয়া বলিল—"ওটি আবার কে? কী ফিকিরে কখন যে থাক বোঝবার উপায় নেই!"

প্রদ্যোত এ-কথার জবাব দিল না।

মথুর একটুখানি অপেক্ষা করিয়া, এবার আসল কথায় নামিল। গলার স্বর নামাইয়া আগ্রহভরে বলিল—"ভালো একটা কাজ হাতে আছে, রাজী হও তো বল। কোনো গোলমাল নেই, ঠিক আধাআধি বখরা।"

প্রদ্যোতের মুখের ভাব একবার বুঝি দেখিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া মথুর আবার বলিল—"একেবারে আসল হীরের খনির সন্ধান পেয়েছি। সবে পাখা উঠেছে। বাপের বিষয় পেয়ে ওড়াবার ফিকির খুঁজে পাচ্ছে না। এই বেলা পাকড়াতে পারলে আর ভাবনা নেই। আমার পুকুর, আমার ছিপ, তোমায় শুধু খেলিয়ে ডাঙ্গায় তুলতে হবে।"

প্রদ্যোত খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া গম্ভীরভাবে বলিল—"আমি ওসব কাজ ছেড়ে দিয়েছি।"

"ছেড়ে দিয়েছ!" মথুর খানিকটা বিস্মিতভাবে প্রদ্যোতের দিকে তাকাইয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। তাহার সে-হাসি আর থামিতে চায় না—"তা ছাড়তে পার, দাদা! বেড়ালেও মাছ ছাড়ে কখনও কখনও ক্ষীরের বাটির সন্ধান পেলে। কিন্তু তোমার ক্ষীরের বাটি তোমারই থাক্। উপরি পাওনায় তোমার আপত্তি কি? দিব্যি গেলে বলছি, কোনো হাঙ্গামা হবে না। সব দায় আমার। কেমন রাজী তো?"

প্রদ্যোতের মনে হইল নিজেকে আর সে সংযত করিয়া রাখিতে পারিবে না। কোথায় তাহার ভিতর যেন ভয়ঙ্কর ঝড় উঠিয়াছে, তাহার মনের

সমস্ত নোঙর সে-ঝড়ের বেগে ছিঁড়িয়া যাইবে এখনই। উন্মত্তের মতো একবার যেন সে চিৎকার করিয়া উঠিতে পারিলে শান্তি পায়।

তবু শান্ত ভাবে প্রাণপণে নিজেকে সংযত করিয়া সে বলিবার চেষ্টা করিল—"না, আমি পারব না।"

মথুর বুঝি এ-উত্তর আশা করে নাই। খানিক নীরবে প্রদ্যোতের মুখের দিকে তাকাইয়া, হঠাৎ সে কঠিন বিদ্রূপের স্বরে বলিল—"বিষ্ণুপদ জেলে একলা আছে, শুনলাম। বেচারার কেউ নাকি সঙ্গী নেই।"

প্রদ্যোত হঠাৎ মথুরকে বিমূঢ় করিয়া দিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল—"তুমি যাও। শিগগির যাও এখান থেকে। কোনো কথা আমি শুনতে চাই না।"

তাহার পর কোনো দিকে না চাহিয়া আরক্ত মুখে সে হনহন্ করিয়া ফিরিয়া গেল।

কিন্তু বৃথাই বুঝি তাহার এ-উত্তেজনা। মথুরকে সে জোর করিয়া বিতাড়িত করিতে পারে; কিন্তু যবনিকার ওপারের যে জীবন আজ উদ্ঘাটিত হইয়াছে, তাহাকে অত সহজে সে তো বিদায় দিতে পারিবে না। মুখ ফিরাইয়া চলিয়া আসিলেও তাহাকে ছাড়ানো সম্ভব নয়। বিস্মৃতির পার হইতে নবজন্মের জগতেও সে-জীবনের গাঢ় ছায়া এবার আসিয়া পড়িয়াছে। চোখ বুজিলে সে-ছায়াকে অস্বীকার করা যায় না।

না, আবার তাহার নৌকার নোঙর ছিঁড়িয়াছে অতীতের বন্যাস্রোতে। ঘাটের নিশ্চিন্ত আশ্রয় তাহার জন্য নয়। আবার তাহাকে ফিরিতে হইবে। গত জীবনের ঋণ তাহার অনেক, তাহার শোধ করিতেই হইবে।

কেমন করিয়া জীবনের অমন পথ সে প্রথম বাছিয়া লইয়াছিল, কে

জানে? সামান্য হয়তো কোনো প্রলোভন, হয়তো সামান্য একটু অসাধারণত্বের লোভ তাহাকে বিচলিত করিয়াছে; কিন্তু তাহার পর আর সে থামিতে বুঝি পারে নাই।

নিজের গতিবেগের প্রেরণাতেই বুঝি ক্রমশ ভাসিয়া গিয়াছে, অসহায় ভাবে নামিয়া গিয়াছে অতল অন্ধকারে। চেষ্টা করিলেও, সেদিন বুঝি তাহার ফিরিয়া দাঁড়াইবার উপায় ছিল না। অথচ এ-জীবনে সার্থকতা শুধু নয়, শান্তিও যে নাই এ-কথা সেদিন সে যেন বুঝিয়াছিল। ক্ষণে-ক্ষণে সেদিনও তাহার মন উদাস হইয়া উঠিয়াছে, অন্ধকার বন্ধ্যা-জীবনের তীর হইতে উৎসুক ভাবে চলিয়াছে ওপারের স্নিগ্ধ শ্যামলতার দিকে, যেখানে মানুষকে ক্ষণে-ক্ষণে উত্তেজনার উগ্র সুরায় মাতাল হইয়া জীবনের ব্যর্থতাকে ভুলিতে হয় না, যেখানে শান্ত স্রোত বয় সৃষ্টির পরম সার্থকতার উদ্দেশ্যে।

ফিরিবার পথ নাই বলিয়াই হতাশ হইয়া সে বুঝি নিজের উপর প্রতিশোধ লইয়াছে, গিয়াছে আরও গভীর অতলতায় নামিয়া। সুখে, শান্তিতে যাহারা বাস করে, আর যাহারা কাপুরুষের মতো আসে উত্তেজনার উগ্র গণ্ডূষ মাত্র পান করিতে—সকলের উপরই তাহার ছিল আক্রোশ। তাহাদের প্রতারণা করাই তাহার শুধু ব্যবসায় নয়, বুঝি বিলাসই ছিল। তাই দিন-দিন সে দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার ক্ষমতা বাড়িয়াছে দিন-দিন।

কত ভাবে, কত অদ্ভুত উপায়ে মানুষকে সে যে ঠকাইয়াছে তাহার বুঝি হিসাব হয় না। তাহার প্রতিভা স্বাভাবিক পথ পায় নাই, তাই বিকৃত ভাবেই তাহার স্ফুরণ হইয়াছে।

এক জায়গায় সে বেশিদিন স্থির থাকে নাই, এক পথ বেশিদিন অনুসরণ

করিতে পারে নাই। তাহার ভিতরের অশান্তি কেবলই তাহাকে নূতন হইতে নূতনতর ক্ষেত্রে ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছে। কখনও এক দলের সহিত গোপন জুয়ার আড্ডায় বসাইয়া নিরীহ নির্বোধ ধনীসন্তানের সর্বনাশ করিয়াছে! কখনও আর এক দলের সহিত ভিড়িয়া পুলিশের সতর্কদৃষ্টি এড়াইয়া, নিষিদ্ধ মাদক-দ্রব্য চালানের বন্দোবস্ত করিয়াছে। তাহার শেষ অপকীর্তি বুঝি জাল নোট চালাইবার চেষ্টা। বিদেশে এই চেষ্টাতেই বিফল হইয়া সে গোপনে দেশে পলাইয়া আসিতেছিল। এবার পলায়ন সে সহজে করিতে পারে নাই, এত দিনে বুঝি সত্যকার বিপদের সহিত তাহার পরিচয় হইল। একজন সঙ্গী তখন ধরা পড়িয়াছে। পুলিশের সতর্ক পাহারা চারিদিকে। কোনো মতে তাহারই ভিতর হইতে ভাগ্যের সহায়তায় সে বুঝি নিষ্কৃতি পাইয়াছিল।

কলিকাতায় আসিবার পূর্বে সমস্ত ঘটনা এবার তাহার স্মরণ হয়। পশ্চিমের একটি শহর হইতে কোনো মতে পুলিশের হাত এড়াইয়া, ট্রেনে আসিয়া উঠিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে সে পারে নাই। ধরা পড়িবার ভয় প্রতি মুহূর্তে। অসীম উদ্বেগের ভিতর তাহাকে সমস্ত ক্ষণ কাটাইতে হইয়াছে। কয়েক জায়গায় ট্রেন বদল করিয়াও নিরাপদ সে হয় নাই, সে উদ্বেগ ও আশঙ্কা ক্রমশই যেন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। জীবনে অনেক দুঃসাহসিক অপকর্ম সে করিয়াছে, কিন্তু এত ভয় বুঝি কখনও পায় নাই। সেদিনও তাহার মনে হইয়াছিল এই ভয় যেন অস্বাভাবিক, বাহিরের কোনো বিপদ ইহার মূল যেন নয়; যেন তাহার অন্তরের কোনো অতলস্পর্শী অজানিত গুহা-মুখ হইতে অন্ধকারের গাঢ় স্রোতে উৎসারিত হইয়া এই অহৈতুক আতঙ্ক তাহার সমস্ত চেতনাকে নিমজ্জিত করিয়া দিতেছে।

অনেকক্ষণ সে এই আতঙ্কের বিরুদ্ধে যুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিল ; এইটুকু তাহার মনে আছে। তাহার পর কখন নামিয়াছিল বিস্মৃতির যবনিকা, কে জানে!

কিন্তু অতীতের এই কলঙ্কিত ইতিহাস প্রদ্যোত এখন অস্বীকার করিতে পারে না কি? প্রায়শ্চিত্ত তাহার কি সম্পূর্ণ হয় নাই! জন্মান্তরের এ-কাহিনী ভুলিয়া সে কি নূতন করিয়া জীবন-রচনার ব্রত লইতে পারে না!

পারে, কিন্তু আগে বুঝি অতীতের ঋণ-শোধ তাহাকে করিতে হইবে। প্রদ্যোত অন্তত তাহাই শ্রেয় বলিয়া বুঝিয়াছে। গত জীবনের সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত সে করিবে। কোনো দেনা সে বাকি রাখিবে না। দেবতার চোখে হয়তো তাহার প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ ; কিন্তু মানুষের জগতের বিচারে এখনও সে ঋণী। সে ঋণও সে শোধ করিবে। অতীতের কোনো ছায়া যেন নূতন জীবনকে বিড়ম্বিত না করে। কোনো মথুর রায়ের প্রতি-হিংসাকে যেন তাহার ভয় করিবার না থাকে।

প্রদ্যোত বিমলকে বুঝাইয়া-শুঝাইয়া দেশে পাঠাইয়া দিল। বিমল যাইতে চাহে নাই। কলিকাতা দেখার সাধ তাহার মেটে নাই বলিয়া যে যাইতে চাহে নাই তাহা নয়, যাইতে চাহে নাই কেমন এক অস্পষ্ট শিশুমনের উপলব্ধির ইঙ্গিতে। সমস্ত দিন রাঙাদার অদ্ভুত পরিবর্তন তাহারও দৃষ্টি এড়ায় নাই। রাঙাদা তাহার সহিত যাইতে পারিবে না, বলিয়াছে। রাঙাদা বলিয়াছে, সামান্য একটু কাজ সারিয়াই সে পরে যাইবে। কিন্তু বিমলের তাহা কেমন যেন বিশ্বাস হয় নাই। সে তাই

থাকিবার জন্য জেদ করিয়াছিল। রাঙাদাকে সঙ্গে লইয়া সেও পরে যাইতে চায়, এই ইচ্ছা জানাইয়াছিল। কিন্তু রাঙাদা এখানে কঠিন। বিমলকে শেষ পর্যন্ত যাইতেই হইল।

স্টেশনে গাড়ির ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বিমল হঠাৎ বলিল—"জানি সব মিথ্যে কথা। তুমি আর সেখানে যাবে না, রাঙাদা!"

এই আশঙ্কাই বুঝি আর একদিন তাহার ব্যাকুল কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল। প্রদ্যোত সেদিনকার মতোই আজ আবার উত্তর দিল—"না, ভাই বিমল, সত্যিই যাব। এখানকার কাজ চুকলেই যাব!" কে জানে, বিমল তাহা বিশ্বাস করিল কিনা। কিন্তু বিশ্বাস করিলেই বা ক্ষতি কি!

হয়তো সত্যই প্রদ্যোত আবার সেখানে ফিরিবে, অতীত জীবনের প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ করিয়া শুরু করিবে নূতন জীবনের রচনা।

সমাপ্ত

প্রেমেন্দ্র মিত্র

রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা গল্পের দিগন্তকে যাঁরা আরো প্রসারিত করেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় শৈলজানন্দের আর প্রেমেন্দ্র মিত্রের; শৈলজানন্দের এক অর্থে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের অন্যতর অর্থে। দীন অভাজনদের নিয়ে গল্প লেখা শুরু করে প্রেমেন্দ্র মিত্র ক্রমে নিজের মনোযোগ ব্যাপ্ত করে দিলেন জীবনের বহুল বৈচিত্র্যে। শুধু বিষয়বস্তুতে যে তিনি অভিনবত্ব আনলেন তাই নয়, পরিবেশসৃষ্টির কুশলতায়, বাকভঙ্গীর উল্লেখযোগ্য সংযমে, অতিলৌকিকতার আভাসে ইঙ্গিতে, রহস্যের আবহ রচনায় এমন শক্তির পরিচয় দিলেন যে কারও আর স্বীকার করতে বাধা রইল না যে রবীন্দ্রনাথের পরও বাংলা ছোটগল্প অনেক শক্তিমান হয়েছে, নতুন স্বাদ এসেছে তাতে। অস্বাভাবিক চিত্তবৃত্তি ও ঘটনাসংস্থানের ওপর গল্প রচনায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতো কৃতিত্ব খুব কম লেখকই দাবি করতে পারেন। আর এই কৃতিত্ব অর্জন করা কত যে দুঃসাধ্য তা যে কোনো দেশের সাহিত্য পর্যালোচনা করলেই স্পষ্ট হবে।

অন্যপক্ষে, কাব্যকলার ক্ষেত্রে বিশ্বাসের সুদৃঢ় ঘোষণায় প্রেমেন্দ্র মিত্র নজরুলের অনুগামী; যা একবার বিশ্বাস করেছেন তা স্পষ্ট করে বলতে কখনো দ্বিধা করেননি :

আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের, মুটে মজুরের,
—আমি কবি যত ইতরের!

পরবর্তীকালের সমাজসচেতন কবিতার ক্রেডো প্রথম প্রেমেন্দ্র মিত্রই ঘোষণা করলেন। শুধু কবিতার নয়, গল্পের, উপন্যাসেরও। সর্বত্রই প্রাণ প্রজ্বলন্ত শক্তির স্বাক্ষর। অন্যান্য লেখকের তুলনায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের বলার কথা বেশি, অথচ সকলের চেয়ে কম কথায় তিনি তাঁর বক্তব্য সারেন। বিবৃতির চেয়ে ইঙ্গিতেই তাঁর বেশি আসক্তি, ব্যক্ত বস্তুর চেয়ে অনুক্তের আবেদনই প্রবলতর। তিনি জানেন পাঠককে দিয়ে কতখানি কল্পনা করিয়ে নেয়া যায়, অনেক সম্ভাবনার মধ্যে শিল্পপরিণতিটিকে আবিষ্কার করার কত বেশি আনন্দ দেয়া যেতে পারে।

কল্লোলযুগের জীবনসন্ধিৎসা প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনায় প্রতিফলিত। আপাতিক সত্যে সন্তুষ্ট না হয়ে শাশ্বতের সন্ধান তিনি অসাধারণ নিষ্ঠার সঙ্গে করেছিলেন। জীবনের যে রূপ তাঁর চোখে পড়ে তা সব সময় মনোহারী নয়, তাই বলে রমনীয়তার অতিরিক্ত আচ্ছাদনে সুশোভিত করে প্রেমেন্দ্র

মিত্র তাকে পরিবেশন করতে যাননি। বাস্তব বর্ণনায় প্রেমেন্দ্র মিত্র কখনো কখনো গোগোলের মতো নিষ্ঠুর, জীবনের অন্তিম সার্থকতা বিচারে নিষ্করুণ শুভবিদ্বেষী। প্রত্যক্ষরূপে আধুনিক সমাজের শিল্পী বলে প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রকৃতিকে ছেড়ে নগরকেই পটভূমি বানিয়েছেন; যে নগর মানুষ সৃষ্টি করেছে, অথচ যে নগর মানুষকেই গ্রাস করতে উদ্যত। পল্লীজীবনের সহজ মসৃণতা ছেড়ে নগরের আবর্ত বুঝি বড় বেশি কুটিল মনে হল মানুষের। নতুন দুঃখ এল, জীবনে অভিনব বৈষম্য দেখা দিল। প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনায় তারই খতিয়ান।

স্বভাবতই বহির্মুখী ও প্রখররূপে ঘটনাসচেতন লেখক বলে প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনায় একঘেয়েমির ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। গল্পে যেমন, কবিতাতেও তেমনি। সমাজমুখিনতা প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম জীবনের কাব্যগ্রন্থে যেমন নতুন সুর সংযোজনা করেছিল, উপলব্ধির অন্তর্মুখী স্রোত তেমনি 'ফেরারী ফৌজ'-এর কবিতায় এনে দিল আশ্চর্য সংহতি, গভীরতার সঙ্গে সংযুক্ত হল উজ্জ্বল স্পষ্টতা।

বাংলা গল্প এবং কবিতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পর প্রেমেন্দ্র মিত্র নিশ্চয়ই এক নতুন অধ্যায়।